ম্যাকসাহেবের নাতনি

সমরেশ মজুমদার

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : বিমল দাস

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

Ayan Chatterjee
Digitally signed by Ayan Chatterjee
DN: cn=Ayan Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.10.08 00:09:04 +06'00'

শিলিগুড়ি থেকে ট্যাক্সি নিয়ে অর্জুন যখন বাগডোগরা এয়ারপোর্টে পৌঁছেছিল, তখন প্লেনের সময় হয়ে গেছে। কিন্তু পৌঁছে শুনল ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট দেরিতে আসছে, হাতে অনেকখানি সময়। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে।

www.boiRboi.blogspot.com

আজ সকাল থেকেই টেনশন শুরু। গতকাল মোটর সাইকেলটা বিগড়ে ছিল। গ্যারাজ থেকে বলল, আজ বিকেলের আগে দেবে না। অর্জুন ঠিক করেছিল, সারাদিন বাড়িতেই কাটাবে। 'কাকাবাবু সমগ্র' হাতে এসেছে, ওটা পড়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু সকালবেলায় আচমকা অমল সোমের চিঠি এল। এই চিঠিটি বেশ কিছুদিন পরে। অমলদা এখন আর জলপাইগুড়িতে থাকেন না। কোথায় থাকেন তা কাউকে জানান না। জলপাইগুড়ির বাড়ি দেখাশোনা করে তাঁর প্রতিবন্ধী ভৃত্য। মাঝে-মাঝে অর্জুন খোঁজখবর নিয়ে আসে।

অমল সোমই অর্জুনের সত্যসন্ধানে দীক্ষাগুরু। বিয়ে-থা করেননি। ইদানীং তিনি সত্যসন্ধানের চেয়ে অন্য কিছুতে ব্যস্ত হয়েছেন। কেউ বলে সন্ন্যাসী হয়েছেন। মাঝে-মাঝে তাঁর চিঠি পায় অর্জুন। তিনি কোথায় আছেন, এক জায়গায় আছেন কিনা

তা অর্জুনের জানা নেই। চিঠির উত্তর দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই।

আজকের চিঠিটা বিদেশ থেকে। অর্জুন অমল সোমের পরিচিত হাতের লেখা দেখতে পেয়েছিল, "স্নেহভাজনেষু, আশা করি ভাল আছ। বিশেষ প্রয়োজনে এই চিঠি লিখছি। কয়েকটি জরুরি কাজে লন্ডনে আছি। এখানে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। মেয়েটির নাম ডরোথি ম্যাকডোনাল্ড। তার পূর্বপুরুষ এক সময় ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। সেই জন্য তাঁকে ভারতবর্ষে থাকতে হয়েছিল। ভদ্রলোক জলপাইগুড়ি শহরে ছিলেন বেশ কিছুকাল। মেয়েটি তার পূর্বপুরুষের কর্মক্ষেত্র দেখতে আগ্রহী। আগামী চোদ্দই অগাস্ট সে কলকাতা হয়ে বাগডোগরায় পৌঁছবে। তুমি তাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করে দেখাবার ব্যবস্থা করো।

তোমার কাজকর্ম নিশ্চয়ই ভাল চলছে। আবেগে তাড়িত হয়ো না, ক্ষুদ্র ঘটনাও যুক্তি দিয়ে বিচার করো। শুভেচ্ছা জেনো।—অমল সোম।"

www.boiRboi.blogspot.com

চিঠিটা পড়ার পর হাতে সময় ছিল না। অমল সোমের অনুরোধ আদেশের চেয়ে অনেক বেশি অর্জুনের কাছে। প্রথমে মনে হয়েছিল, ডরোথি ম্যাকডোনাল্ড জলপাইগুড়িতে এসে কোথায় থাকবে? এখানে ভাল হোটেল তেমন নেই। কদমতলায় একটি সাধারণ হোটেল আছে, এ ছাড়া সরকারি তিস্তা ভবন। বরং শিলিগুড়িতে অনেক ভাল ব্যবস্থা এবং সেখানে থাকাই ওঁর পক্ষে সুবিধেজনক।

বাইক নেই, দেড় ঘন্টার রাস্তা কোনও মতে ডিঙিয়ে যখন সে এয়ারপোর্টে পৌঁছাল তখন বাইরে চড়া রোদ, প্লেন আসেনি। বাগডোগরা এয়ারপোর্টটা বেশ ছোট। যাত্রীদের অপেক্ষা করার

জায়গাটা এখন গমগম করছে। যে প্লেনটি আসছে, তাতেই এঁরা কলকাতায় যাবেন। অর্জুন লক্ষ করেছে, ট্রেনে ওঠার আগে যাত্রীদের মুখের হাবভাব দেখে তেমন কিছু মনে হয় না, কিন্তু প্লেনে ওঠার আগে একটা আলাদা চেহারা ধরা পড়ে। একটু যেন কৃত্রিম আর সেটা নিজেকে মূল্যবান মনে করার চেষ্টায় কি না জানা নেই।

প্লেন নামল। ছোট প্লেন, যাত্রীর সংখ্যা তাই অল্প। সিঁড়ি দিয়ে যারা নেমে এল, তাদের মধ্যে একমাত্র বিদেশিনীকে চিনতে অসুবিধে হল না। মেমসাহেবদের বয়স বোঝা বেশ মুশকিল। অর্জুন আন্দাজ করল ইনি তিরিশের নিচেই হবেন।

ফেন্সিং পেরিয়ে ভদ্রমহিলা বেশ নার্ভাস ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাতে অর্জুনের মনে হল, ওর বয়স বাইশের বেশি হতেই পারে না। চোখের মণি নীল, সোনালি চুল, পরনে নীল স্কার্ট আর সাদা জামা। অনেকটা স্কুল-ইউনিফর্মের মতো। হাতে একটা সুন্দর ব্যাগ। ওকে সবাই লক্ষ করছে এটা দেখতে পেয়ে অর্জুন এগিয়ে গেল, "এক্সকিউজ মি।"

মহিলা মুখ ফেরাতেই অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি ডরোথি ম্যাকডোনাল্ড?"

সঙ্গে-সঙ্গে হাসি ফুটল। খুব মিষ্টি হাসি। আর সেই হাসি দেখে অর্জুনের মনে পড়ল 'সাউন্ড অব মিউজিকের' জুলি ক্রিস্টির কথা। এর সঙ্গে প্রচণ্ড মিল সেই অভিনেত্রীর।

ডরোথি মাথা নেড়ে ইংরেজিতে বলল, "হ্যাঁ। আমি ডরোথি। তুমি অর্জুন?"

নিজেকে অর্জুন ভাবতে ভাল না লাগলেও সে মাথা নাড়ল।

"তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে। আমি একটু নার্ভাস টাইপের। ভাবছিলাম তুমি না এলে আমি কী করব! অবশ্য

মিস্টার সোম তোমার ব্যাপারে আমাকে অনেক ভরসা দিয়েছেন।"

অর্জুন হাসল, "উনি আমাকে বেশি স্নেহ করেন।"

ডরোথি মাথা নাড়ল, "না। ওঁর সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে ওসব ব্যাপার ওঁর তেমন নেই। উনি খুব প্র্যাকটিক্যাল মানুষ।"

অমলদা ডরোথিকে কী বলেছেন জানা নেই, অতএব এ-বিষয়ে কথা বাড়াল না অর্জুন। সে হাত বাড়িয়ে হাতব্যাগটা চাইতেই ডরোথি মাথা নাড়ল, "না, না। এটা আমি নিজেই বইতে পারব। মুশকিল হচ্ছে আমার সুটকেস নিয়ে। ওটা খুব ভারী।"

অর্জুন দেখল প্লেনের পেট থেকে মালপত্র নামিয়ে আনছে কর্মীরা। সেটাকে হস্তগত করতে এগিয়ে গেল সে। ডরোথি যে ইতিমধ্যে পাবলিকের দ্রষ্টব্য বিষয় হয়ে গেছে, সেটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। সবাই হাঁ করে দেখছে মেয়েটাকে। অর্জুন খানিকটা দূর থেকে ডরোথিকে দেখল সাগ্রহে চারপাশে তাকিয়ে দেখছে এখন। মানুষজনের চাহনিকে কোনও গ্রাহ্য করছে না। আমেরিকানদের মতো ডরোথি লম্বা নয়। গায়ের রঙে ক্যাটকেটে ভাব নেই। বরং মোলায়েম গমের মতো চামড়ার রঙ। চোখাচোখি হতে ডরোথি হাসল। হাসলে যে ওকে খুব সুন্দর দেখায় তা নিশ্চয়ই ওর জানা।

সুটকেসটা সত্যি খুব ভারী। বাইরে বের করে ট্যাক্সিতে ওঠাতে গিয়ে মনে হল কাঁধ থেকে হাতটা ছিঁড়ে যাবে। শিলিগুড়ির ট্যাক্সির মিটার থাকে না, রঙ আলাদা করে তাদের চেনানোর ব্যবস্থা নেই। পেছনের আসনে বসে ডরোথি জিজ্ঞাসা করল, "তুমি নিজে গাড়ি চালাও না?"

প্রথমে বুঝতে পারেনি অর্জুন। তার নিজস্ব গাড়ি নেই। মোটরবাইকেই চমৎকার চলে যায়। সম্প্রতি এক বন্ধুর গাড়ি নিয়ে ট্রায়াল দিয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করেছে সে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ডরোথি বলল, "ইণ্ডিয়ায় দেখছি ড্রাইভাররাই গাড়ি চালায়, মালিক নিজে স্টিয়ারিং-এ বসে না।"

অর্জুন হাসল, "তুমি ভুল করছ। এটা একটা ট্যাক্সি। আমার গাড়ি নেই।"

"ট্যাক্সি? অদ্ভুত! লোকে কী করে বুঝবে কোনটা ট্যাক্সি, কোনটা নয়।"

অর্জুন মনে-মনে বলল, অবাক হওয়ার অনেক কিছু চারদিকে ছড়িয়ে আছে মেয়ে। আমাদের অনেক কিছুই অদ্ভুত! আগে প্রাইভেট গাড়ির নাম্বার প্লেটের শেষে 'ওয়াই' থাকলে আমরা বুঝতাম ওটা ভাড়া খাটে, আজকাল আর সে-নিয়ম মানা হয় না। একজন বিদেশি এদেশে এলে এত অসঙ্গতি বের করতে পারে, যাতে অভ্যস্ত হয়ে আছি বলে আমাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

www.boiRboi.blogspot.com

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এয়ারফোর্সের এলাকা দিয়ে ট্যাক্সিটা যাচ্ছিল। ইউনিফর্ম-পরা সৈনিকরা সাইকেলে চেপে যাওয়া-আসা করছে। ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "এটা কি সামরিক জায়গা?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"ওরা তোমাদের এই রাস্তা ব্যবহার করতে দিচ্ছে কেন?"

"এয়ারপোর্টে যাওয়া-আসার আর কোনও রাস্তা নেই বলে।"

"অদ্ভুত!"

অর্জুন হাসল। ইংরেজি বলতে তার তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। আর ডরোথির উচ্চারণ খুব স্পষ্ট বলে কথা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। ওর মনে পড়ল লন্ডন বা নিউ ইয়র্কে গিয়ে ইংরেজি ভাষা বুঝতে সে এক সময় কী রকম হিমশিম খেয়েছিল!

"অমলদার চিঠি আমি আজ সকালে পেয়েছি।"

"অমলদা কে?"

"যিনি তোমাকে আমার কথা বলেছেন। ওঁর পুরো নাম অমল সোম।"

"আচ্ছা! কিন্তু তুমি বললে অমলদা?"

"বয়স্কদের আমরা নামের সঙ্গে দাদা বলি। সেটা সংক্ষেপে অমলদা হয়েছে।"

ডরোথি ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল।

অর্জুন বলল, "উনি লিখেছেন তোমার পূর্বপুরুষ এদিকে চাকরি করতেন।"

"হ্যাঁ। আমার ঠাকুরদা। উনি ফরেন সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন। অনেক জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত বাংলার উত্তর প্রান্তে দীর্ঘকাল চাকরি করেন। ওঁর লেখা একটা ডায়েরি আমি হঠাৎ পাই। তা থেকে ব্যাপারটা জানতে পারি।"

www.boiRboi.blogspot.com

"উনি কি এখনও বেঁচে আছেন?"

"না। বেঁচে থাকলে ওঁর বয়স ছিয়াশি হত।" কথা বলতে-বলতে হাতব্যাগ খুলে একটা ছোট্ট ডায়েরি বের করে ডরোথি পাতা ওলটাল। ট্যাক্সি এখন বাগডোগরা বাজার পেরিয়ে শিলিগুড়ির দিকে ছুটছে।

"এখানে আমি কিছু নোট করে নিয়েছি। জলপাইগুড়ি কত দূরে?"

"এই ট্যাক্সি নিয়ে সোজা গেলে এক ঘন্টার মতো পড়বে।"

"মিস্টার সেন বলেছিলেন তুমি সেখানেই থাকো।"

"হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন।"

"আমরা তো জলপাইগারিতে যাচ্ছি?"

"নামটা জলপাইগারি নয়, উচ্চারণ হবে জলপাইগুড়ি। হ্যাঁ,

আমরা যেতে পারি, কিন্তু মুশকিল তোমার থাকার জন্য ভাল হোটেল ওখানে নেই। আমি ভেবেছিলাম তোমাকে শিলিগুড়ির হোটেলে থাকতে বলব।"

"শিলিগুড়ি। হ্যাঁ, এই নামটা আছে, তবে খুব ইম্পর্ট্যান্ট নয়।"

"তোমার ঠাকুরদার সময় শিলিগুড়ির কোনও ভূমিকা ছিল না, কিন্তু এখন কলকাতার পরেই শিলিগুড়ি মূল্যবান শহর।"

"কোনও গেস্ট হাউস নেই জলপাইগুড়িতে?"

"চলো দেখি।"

"ঠাকুরদা ওখানকার সার্কিট হাউসের খুব প্রশংসা করেছিলেন।"

অর্জুন কিছু বলল না। অর্ধ শতাব্দী আগে জলপাইগুড়ি যা ছিল এখন তা নেই। কোণঠাসা হয়ে-হয়ে শহরটা কোনও মতে ধুঁকছে। তিস্তা ভবনে নিয়ে যেতে হবে ডরোথিকে। জায়গা পাওয়া গেলে ভাল। সে ডরোথির দিকে তাকাল। ডরোথি জানলা দিয়ে চায়ের বাগান দেখছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত! ওর ঠাকুরদার কর্মস্থল ছিল এদিকে। ভদ্রলোক নেই। তাঁর ডায়েরি পড়ে ওর মনে হল জায়গাটা দেখে আসা দরকার আর অমনই চলে এল? এই আসার জন্য প্রচুর টাকা এবং সময় খরচ হয়েছে এবং তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই! ওরা মাঝে-মাঝে এমন কাণ্ড করে! যে-লোকটা প্রথম পাহাড়ে ওঠার কথা ভেবেছিল তাকেও তো লোকে অবাক চোখে দেখেছিল। আমরা বলি ইউরোপ এবং আমেরিকার মানুষ খুব প্র্যাকটিক্যাল। তারা অপ্রয়োজনীয় কোনও কাজ করে না। কিন্তু যে মানুষ ইংলিশ চ্যানেল পার হয়, নায়েগ্রার ওপর থেকে লাফিয়ে রেকর্ড করতে চায় জীবনের বিনিময়ে, তারা কতখানি প্র্যাকটিক্যাল? সেদিক দিয়ে আমরা তো এতকাল ঝুঁকি

এড়িয়ে ঘরে বসে থাকতে পছন্দ করে এসেছি।

ট্যাক্সি শিলিগুড়ি শহরে ঢুকল। অর্জুন অনুরোধ করায় ট্যাক্সি ড্রাইভার প্রথমে রাজি হচ্ছিল না। তাকে নাকি জলপাইগুড়ি থেকে খালি ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে আসতে হবে, সেটা পোষাবে না। অর্জুন অন্য সময় হলে তর্ক করত। কদমতলার বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়ালেই লোকটা শিলিগুড়ির যাত্রী প্রচুর পাবে এটা জানা কথা। ডরোথির জন্যই সে কিছুটা বাড়তি টাকা দিতে রাজি হল।

“তোমাদের এখানকার শহরগুলো তৈরির সময় কোনও পরিকল্পনা ছিল না ?”

“বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই না।”

“কেন ?”

“ব্রিটিশরা আমাদের এইভাবেই অভ্যস্ত করেছিল।”

অর্জুনের উত্তর শোনামাত্র ডরোথি অবাক হয়ে তাকাল, “তোমাদের দেশে এখনও আমার পূর্বপুরুষদের প্রভাব আছে ?”

www.boiRboi.blogspot.com

“ব্রিটিশদের তৈরি অনেক ভাল জিনিস নিয়ে আমরা যেমন এখনও গর্ব করি, তেমনই ওদের কীর্তির জন্যে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে আমাদের দাম দিতে হয়।”

“তোমার কথার মানে আমি বুঝতে পারলাম না।”

“তোমার পূর্বপুরুষরা এ-দেশটাকে কলোনি হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এখান থেকে যা কিছু ভাল তা দেশে নিয়ে যেত তারা। আর নিজেরা থাকত বলে কোনও মতে বসবাসের যোগ্য করে রেখেছিল। আমাদের কথা তারা কখনওই ভাবেনি। তবে কোনও-কোনও ব্রিটিশ মানুষ হিসেবে অসাধারণ ছিলেন। তাঁদের কথা আমি বলছি না।”

ডরোথি সোজা হয়ে বলল। গাড়ি তখন শিলিগুড়ি ছাড়িয়েছে। ডরোথি বলল, “আমার পূর্বপুরুষ তোমাদের এখানে

সরকারি চাকরি করতে এসেছিলেন আর আমি এত কাল পরে তাঁর কর্মক্ষেত্র দেখার জন্যে ছুটে এসেছি এ-কথা নিশ্চয়ই তুমি বিশ্বাস করোনি ?”

“আমি অবাক হয়েছি !”

“তা হলে সত্যি কথা বলছি। কারণ তোমার সাহায্য আমার প্রয়োজন।”

অর্জুন তাকাল।

ডরোথি বলল, “আমি এসেছি প্রায়শ্চিত্ত করতে।”

“কিসের প্রায়শ্চিত্ত ?”

“আমার পিতামহ যে অন্যায় করেছেন, যার জন্যে তিনি শেষজীবনে অনুতাপে দগ্ধ হয়েছেন সেই কারণেই আমি এখানে এসেছি। উনি সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। তাঁকে লন্ডন, দিল্লি, কলকাতার আদেশ মান্য করতে হত। তখন তোমাদের দেশের কিছু মানুষ স্বাধীনতা পাওয়ার জন্যে আন্দোলন করছিল। সেই আন্দোলনকে দমন করার দায়িত্ব ছিল ঠাকুরদার ওপর। জলপাইগুড়িতে থাকার সময় ঠাকুরদা প্রতিদিনের ঘটনা তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন। কীভাবে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধরতেন, তাঁদের মুখ থেকে কথা বের করার জন্যে অত্যাচার করতেন, তার বিস্তৃত বিবরণ আমি পড়েছি। আর এসব কাজের পেছনে তাঁর যুক্তি ছিল যে, তিনি তাঁর দেশ ব্রিটেনের জন্যেই করেছেন। তাঁর ওপরওয়ালার নির্দেশ তিনি পালন করেছেন।” ডরোথি বেশ উত্তেজিত গলায় কথা বলছিল। আর সেই কারণে তার ইংরেজি শব্দগুলো একটু অন্যরকম ভাবে অর্জুনের কানে বাজছিল। ডরোথি একটু থামতেই অর্জুন বলল, “এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। চাকরি করতে গেলে ওপরওয়ালার নির্দেশ মানতেই হয়। তবে ইতিহাস বলে কোনও-কোনও ইংরেজ

অফিসার অধিকারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন।"

ডরোথি মাথা নাড়ল, "ঠিক। সেই কথাই ঠাকুরদা তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন। কেউ বোমা নিয়ে তাঁকে মারতে আসছে জানার পর তিনি কী করতে পারতেন? ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবেন না আক্রমণকারীর মুখোমুখি হবেন? সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্যে তাঁকেও অস্ত্র চালাতে হত। সেই লোকটা মরে গেলে শহিদ হয়ে যেত আর ঠাকুরদা খুনি। অথচ দু'জনেই তার কর্তব্য করছে।"

"তুমি বললে এদেশে এসেছ পূর্বপুরুষের করা অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে। অথচ তুমি পূর্বপুরুষের কাজকেই এখন সমর্থন করছ।" অর্জুন বলল।

"আমি ততটাই সমর্থন করছি, যতটা তাঁদের করা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আরও অনেকের মতো আমার ঠাকুরদা সীমা হারিয়েছিলেন। তাঁর ডায়েরিতে আমি তিনজন মানুষের সাড় পেয়েছি যাদের ওপর বীভৎস অত্যাচার করেছেন তিনি এবং তাঁর পুলিশ। এগুলো স্রেফ জেদের বশে করেছিলেন। শেষ বয়সে দেশে বসে তিনি এই তিনটি কাজের জন্যে অনুশোচনা করতেন।" ডরোথি তাকাল স্পষ্ট চোখে, "আমি ওই তিনটি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"কতদিন আগের ঘটনা?"

"প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগের কথা।"

চোখ বন্ধ করল অর্জুন। ওরে ব্বাস! এ তো অনেক সময়। অতদিন আগে যাঁদের ওপর ডরোথির ঠাকুরদা অত্যাচার করেছিলেন তাঁরা কি এখনও বেঁচে আছেন? ডরোথির ঠাকুরদাই তো এখন পৃথিবীতে নেই। সে জিজ্ঞেস করল, "যদি তাঁরা না বেঁচে থাকেন?"

www.boiRboi.blogspot.com

"তা হলে তাদের পরিবারের কাছে যাব।"

"এই তিনজন মানুষ কারা ?"

"দুঃখিত। ইণ্ডিয়ান নাম আমার ঠিকঠাক মনে থাকে না। ঠাকুরদার ডায়েরিতে তাদের নাম আছে। দেখে বলতে হবে।" ডরোথিকে এখন একটু স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল।

"তোমার ঠাকুরদার নাম কী ?"

"রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড।"

জলপাইগুড়ি শহরের মানুষ একজন ইংরেজের কথা অনেকদিন জানত। তাঁর নামে তিস্তার পারে একটা ফেরিঘাটকে লোকে কিং সাহেবের ঘাট বলে চিনত। তিস্তার ওপর ব্রিজ এবং দু'পাশে বাঁধ হওয়ার পর সেই ঘাটের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে এবং নামটাও হারিয়ে গিয়েছে। তবে এখনও কিছু-কিছু সরকারি বাড়ি ব্রিটিশদের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের আর পাঁচটা শহরের মতো জলপাইগুড়ি ইংরেজদের কথা ভুলতে পেরেছে। রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড নামের একজন ইংরেজ প্রশাসক যে এই শহরে ছিলেন তা এখন কারও জানার কথা নয়, যদি না তিনি সেই আমলের মানুষ হন। অর্জুন এই নামটি প্রথম শুনল।

তিস্তা ভবনে জায়গা পাওয়া গেল। রেসকোর্স ছাড়িয়ে এই সরকারি অতিথিশালার পরিবেশ চমৎকার। ডরোথিকে সেখানে তোলার পর সমস্যা দেখা দিল খাবার নিয়ে। শুধু চা-টোস্ট ছাড়া সেখানে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। যিনি রান্না করেন তিনি ছুটিতে গিয়েছেন। হোটেল থেকে ভাত-তরকারি আনলে ডরোথির পক্ষে মারাত্মক হবে, কারণ সে ঝাল একদম সহ্য করতে পারে না। ইতিমধ্যে কলকাতায় নামী হোটেলে শখে পড়ে ইণ্ডিয়ান কারি খেয়ে সে বিপদে পড়েছিল। জলপাইগুড়ি শহরে বিদেশিদের উপযুক্ত কোনও খাবারের দোকান নেই।

ডরোথিকে বিশ্রাম নিতে বলে অর্জুন পোস্ট অফিসের মোড়ে চলে এল। তার মনে হচ্ছিল এপিদা এ-ব্যাপারে কিছু করতে পারেন। এ পি রায় এই শহরের বিখ্যাত শিল্পপতি, অনেক চা-বাগানের মালিক। জলপাইগুড়ি এবং কলকাতার খেলাধুলোর সঙ্গে জড়িত। অর্জুনকে বেশ পছন্দ করেন। মিনিট পাঁচেক হেঁটে এপিদার বাড়িতে পৌঁছে সে হতাশ হল। এপিদা কলকাতায় গিয়েছেন। টাউন ক্লাবের সন্তু চ্যাটার্জি সেখানে ছিল। অর্জুনের সমস্যার কথা শুনে বললেন, "আজকাল সাহেবরা তো ঝোল-ভাত খায়। মাসিমাকে বল কম ঝাল দিয়ে রেঁধে দিতে, দেখবি দিব্যি খেয়ে নেবে।"

অর্জুনের খেয়াল হল মায়ের কথা। পেটের অসুখের জন্য মা নিজের জন্য ঝালবিহীন রান্না রাঁধেন। সেটা কম উপাদেয় নয়। মাকে বললেই হয়।

www.boiRboi.blogspot.com

সন্তুদা জিজ্ঞেস করলেন, "মেমসাহেবটি কি বেড়াতে এসেছেন ?"

"হ্যাঁ। ওঁর ঠাকুরদা এক সময় এই শহরে চাকরি করতেন।"

বারান্দার কোণে চেয়ারে গুটিসুটি মেরে এক বৃদ্ধ বসেছিলেন। এ পি রায়ের বাবা এস পি রায়ের আমলের মানুষ। সম্ভবত ওদের কথা শুনছিলেন তিনি। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "নাম কী লোকটার ?"

"রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড।"

মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, "কত সাহেব এল গেল, কত তাদের নামের বাহার। একজনের নাম ছিল শেকস্‌পিয়র। বুঝলে সন্তু, লোকটা নিজের নাম সই করতে পারত না। অশিক্ষিত। লন্ডনে গুণ্ডামি করত। তাকে এখানে পুলিশ করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তা

তাকে রায়কত পাড়ার জীবন মিত্তিরের বড় ছেলে পঞ্চানন এমন টাইট দিয়েছিল— !"

"এ গল্প আমি অনেকবার শুনেছি মামা।" সন্তুদা বললেন।

"শুনবেই তো। একটা মানুষের জীবনে তো লক্ষ লক্ষ গল্প থাকতে পারে না। যা দেখেছি তাই বলছি। তখন ছিল দেশপ্রেম, ডেডিকেশন। আহা।"

"আপনি রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ডের কথা মনে করতে পারছেন না ?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল। বৃদ্ধকে তার ভাল লাগছিল।

"ম্যাক— । ম্যাক সাহেব ?"

"তা তো জানি না।"

"একজন ছিল। সবাই তাকে ম্যাকসাহেব বলত। খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োল ম্যাকের দাপটে।" বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, "সেই ম্যাক ছিল টেরার।"

সন্তুদা অর্জুনকে নিয়ে খানিকটা দূরে সরে এলেন, "ওঁর মাথা ঠিক নেই। তুমি একজনের কাছে যেতে পার। জলপাইগুড়ির ইতিহাস ভদ্রলোকের জানা।"

www.boiRboi.blogspot.com

"কার কথা বলছেন ?"

"সুধীর মৈত্র। এক কালে অধ্যাপনা করতেন। পাহাড়ি পাড়ায় থাকেন। অনুপকে তো চেনো। ওদের দুটো বাড়ি পরে ওঁর বাড়ি।"

সুধীর মৈত্রের বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। জলপাইগুড়ি শহরে বসে বইপত্রে শুধু নিজের জন্যে যদি কেউ ডুবে থাকেন তা হলে তাঁর নাম সুধীর মৈত্র। নিজের পরিচয় দিতে ভদ্রলোক অর্জুনকে বসতে বললেন। চারপাশে বইয়ের স্তূপ। মেঝেতে শতরঞ্জি পাতা। কোনও আসবাব নেই। ভদ্রলোক বসে আছেন বাবু হয়ে। সত্তরের ওপর বয়স হলেও

শক্ত আছেন। পরনে ফতুয়া পাজামা। চোখে চশমা, চুলগুলো ধবধবে। বললেন, "তোমার কথা শুনেছি। লাইটারটা তো ?"

অর্জুন লজ্জা পেল "হ্যাঁ।"

"বল, কী জন্য এসেছ ?"

অর্জুন জানাল। সুধীরবাবু বললেন, "মেয়েটি নিশ্চয়ই তার দাদু সম্পর্কে সব জানে, তাকে জিজ্ঞেস না করে তুমি আলাদা করে জানতে চাইছ কেন ?"

"এখন পর্যন্ত বলতে পারেন শুধুই কৌতূহল। জানা থাকলে ওর সঙ্গে কথা বলতে সুবিধে হবে। তা ছাড়া ও জেনেছে দাদুর ডায়েরি পড়ে। সেটা কতখানি সত্যি তাতেও তো সন্দেহ থাকবে।" অর্জুন বলল।

"মনে হয় সত্যি। কারণ ইংরেজরা যখন নিজের জন্যে ডায়েরি লেখে তখন বানিয়ে লেখে না। কোন সময়টার কথা বললে ?"

"ধরুন থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি টু।"

"ও ব্বাবা। একেবারে অগ্নিগর্ভ কাল। ওঁর নাম রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড। তাই তো ?" সুধীরবাবু উঠলেন। প্রায় দেওয়াল ঢাকা বইয়ের রাশির মধ্যে খুঁজতে শুরু করলেন উবু হয়ে। শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলেন বইটা। পাতলা বইটির পাতা ওলটাতে ওলটাতে ওঁর মুখে স্বস্তির হাসি ফুটল। "একটা ছোট শহরকে নিয়ে খুব বেশি লোক ভাবে না। কলকাতার তিনশো বছর নিয়ে প্রচুর বই আছে তবু প্রথম পঞ্চাশ বছরের সব কিছু আমরা জানতে পারি না। আর জলপাইগুড়ি নিয়ে কে মাথা ঘামায় ? তবু কিছু-কিছু অন্য ধরনের মানুষ কাজ করেছেন বলে এখনও আমরা ফিরে তাকাতে পারি।" কথা বলছিলেন পাতা ওলটাতে ওলটাতে। হঠাৎ স্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি 'মধুপর্ণী' পত্রিকায় জলপাইগুড়িকে নিয়ে লেখা সংখ্যাটা পড়েছ ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। আমার কাছে আছে।"

"খুব ভাল কাজ। সবক'টা দিক কভার করা হয়েছে। পত্রিকাটা কখনও হাতছাড়া কোরো না। হ্যাঁ, কী নাম যেন ?"

"রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড।"

"ইয়েস। পেয়েছি। থার্টি ফাইভ নয়, থার্টি ফোরে ভদ্রলোক জলপাইগুড়িতে আসেন। বাঃ, ইনি তো দেখছি টেগার্টের সহোদর।"

"টেগার্ট ?"

"সেই কুখ্যাত ব্রিটিশ, যিনি কলকাতায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের টুঁটি টিপে ধরে ব্রিটিশ সিংহকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। রিচার্ড সাহেবও সেই জাতের কর্মচারী। তাঁর প্রতাপে জলপাইগুড়ির স্বাধীনতা আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়েছিল। এই বইটিতে লেখা আছে তিনি যোগ্য হাতে বিদ্রোহীদের দমন করেছিলেন। বুঝতেই পারছ এই বই সাহেবদের লেখা। হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়েছে।" বইটি রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন সুধীরবাবু। তারপর মাথা নাড়লেন, "না, শুধু স্মৃতির ওপর নির্ভর করে তোমাকে বলা ঠিক হবে না। তুমি বিকেলবেলায় আসতে পারবে ? আমি এর মধ্যে আশা করছি ওঁর সম্পর্কে তথ্য জানতে পারব।"

অর্জুন বলল, "ঠিক আছে। তবে এ নিয়ে আপনাকে খুব ব্যস্ত হতে হবে না। ওই মেয়েটি নাম বলায় আমার কৌতূহল হয়েছিল, এইমাত্র।"

"কৌতূহল হওয়াই তো স্বাভাবিক। একটি ব্রিটিশ মেয়ে অতদূর থেকে ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে ছুটে এল তার দাদুর কর্মস্থল দেখতে, ব্যাপারটা অভিনব। আচ্ছা, মেয়েটি কি বর্ধমানে যাওয়ার কথা বলেছে ? সেখানেও রিচার্ড সাহেব কিছুদিন

ছিলেন !"

"না। আমাকে কিছু বলেনি।"

"তা হলে জলপাইগুড়ির বিশেষ গুরুত্ব ওর কাছে আছে। যে মানুষটির জন্যে আছে, তার সম্পর্কে আমাদের আরও তথ্য জানা দরকার। তুমি বিকেলে এসো।"

সব শুনে মা বললেন, "আহা, বিদেশ বিঁভুই থেকে এসেছে মেয়েটা, তাকে তুই না খাইয়ে রাখবি এ কেমন কথা ? ওকে বরং আমাদের বাড়িতে নিয়ে আয়।"

অর্জুন অবাক হল, "আমাদের বাড়িতে ? এখানে ও থাকতে পারবে ?"

"কেন পারবে না ? আমরা তো আছি।"

"ওহো, তুমি বুঝতে পারছ না, ওরা এরকম বাঙালি পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত নয়।"

"তুই সব জেনে বসে আছিস ! সিস্টার নিবেদিতা থাকতেন না ? অ্যানি বেসান্ত ছিলেন না ? নেলি সেনগুপ্তের নাম শুনিসনি ? তুই যা, মেয়েটাকে নিয়ে আয়। ও যেমন খেতে চায় তেমনই নাহয় আমি বানিয়ে দেব।" মা আশ্বাস দিলেন।

অর্জুন নিজের বাড়ির দিকে তাকাল। মধ্যবিত্ত চেহারার এই বাড়িটি তার কাছে প্রিয় হলেও একজন বিদেশিনীর কাছে অনেক অসুবিধের কারণ হবেই। মা সেটা বুঝবেন না। তার চেয়ে মায়ের রান্না খাবার যদি ডরোথির কাছে সে পৌঁছে দেয়, তা হলে

www.boiRboi.blogspot.com

দু'কূলই রক্ষে হবে। মাকে সে কোনও মতে এই ব্যবস্থায় রাজি করালো।

মোটর বাইকটা বিকেলের আগে তৈরি হবে না। ওটা থাকলে ঘোরাফেরা করা সহজ হত। স্নান সেরে মায়ের রান্না খাবার টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে নিয়ে রিকশায় চেপে তিস্তা ভবনের দিকে চলল সে। এখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। রাস্তায় মানুষ কম। হঠাৎ তার খেয়াল হল ডরোথি আসছে ইংল্যান্ড থেকে। লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে বাগডোগরায় নামাই তো স্বাভাবিক ছিল। তা না করে ও কলকাতা ঘুরে এল কেন? কলকাতায় কি ওর কোনও কাজ ছিল? ওর মতো একা মেয়ের কলকাতা শহরে কী কাজ থাকতে পারে, যখন জলপাইগুড়িতে আসার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছে?

টিফিন ক্যারিয়ার দেখে খুব খুশি ডরোথি। যখন শুনল অর্জুনের মা নিজের হাতে রান্না করেছেন তখন আরও উচ্ছ্বসিত। বলল, "লন্ডনে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে আমি একবার খেয়েছি। ফুড ওয়াজ গুড। কিন্তু ঠাকুরদার ডায়েরিতে বেঙ্গলি কারির কথা পড়েছি, সেটা কখনও খাইনি। আচ্ছা, খুব মশলা দেওয়া নয় তো?"

অর্জুন বলল, "খেয়ে দ্যাখো।"

তিস্তা ভবনের বেয়ারা এসে টিফিন ক্যারিয়ারের খাবার সার্ভ করল প্লেটে। কাঁটা চামচের বদলে অর্জুনকে হাত দিয়ে খেতে দেখে ডরোথি উৎসাহিত হল। মায়ের হাতের রান্না অর্জুনের খুব প্রিয়। আজ অবশ্য ইচ্ছে করেই মশলা কম দিয়েছেন, ঝাল তো নয়ই। অর্জুন ঠিক সেই স্বাদ না পেলেও ডরোথি খুব খুশি। বলল, "তোমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করব। এইসব রান্নার রেসিপি চাই।"

www.boiRboi.blogspot.com

"তুমি কতদিন আছ এখানে?"

"এটা নির্ভর করছে আমার কাজ কবে শেষ হচ্ছে তার ওপর।"

খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে ডরোথি বলল, "এভাবে হাত দিয়ে আমি কখনও খাইনি।"

"তুমি তো কখনওই ইন্ডিয়ায় আসোনি।"

"দ্যাট্স রাইট।"

"আচ্ছা, তুমি দিল্লি থেকে সরাসরি না এসে কলকাতা হয়ে এলে কেন?"

ডরোথি মাথা নাড়ল, "আমি জানতাম না দিল্লি হয়ে এখানে আসা যায়। আমার টিকিট কলকাতা পর্যন্ত করা ছিল।"

ব্যাপারটাকে অস্বাভাবিক বলে মনে না অর্জুনের। জলপাইগুড়িতে পৌঁছবার জন্য বাগডোগরা এয়ারপোর্টে নামতে হবে, তা লন্ডনের ট্র্যাভেল এজেন্টরা জানতে পারে। ব্যাগ থেকে একটা লম্বা ডায়েরি বের করে ডরোথি সোফায় বসল, "যে তিনজনের নাম-ঠিকানা ঠাকুরদার ডায়েরিতে ছিল, তাদের তুমি আজই খুঁজে বের করতে পারবে?"

অর্জুন হাসল, "তাঁরা যদি জীবিত থাকেন এবং এই শহরে বাস করেন, তা হলে চেষ্টা করতে পারি। আচ্ছা, ঠিকানা যখন আছে বলছ তখন লন্ডন থেকে ওঁদের চিঠি লিখলে না কেন? সেটা অনেক সহজ হত।"

"আমি নিজে ওঁদের সামনে যেতে চাই।"

"ওঃ। নামগুলো বলো।"

"কামালাকান্ত রয় বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি। ঠিক আছে?"

"কমলাকান্ত রায়। দ্বিতীয় নাম?"

"দেবাদাস মিটার।" ডরোথি মন দিয়ে পড়ছিল, "হি ইজ ফ্রম

রাইকটপাড়া।" ডরোথি হাসল। নিজের নাম উচ্চারণ যে সঠিক হয়নি, তা বুঝতে পারছিল।

"তিন নম্বর মানুষটির নাম তারিণী সেন। এর কোনও ঠিকানা নেই।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "কমলাকান্ত রায়ের নাম আমি শুনেছি। বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। কিন্তু তিনি মারা গিয়েছেন অনেক বছর আগে।"

"ওঃ। ওঁর স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে ?"

"তারা থাকতে পারেন।"

"তা হলে তাঁদের সঙ্গেই দেখা করতে চাই।"

অর্জুন ঘড়ি দেখল। "এখন দুপুরবেলা। এই সময় এখানে সবাই খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম নেয়। আমরা বরং বিকেলের দিতে পারি।"

ডরোথির সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে অর্জুন যখন উঠে দাঁড়াল, তখন দুটো বেজে গেছে। ডরোথি বলল, "তুমি চলে যাচ্ছ, আমার কিন্তু এখানে বসে থাকতে একটুও ভাল লাগছে না।"

অর্জুন সেটা বুঝতে পারছিল। কিন্তু এই ভরদুপুরে মেয়েটাকে নিয়ে সে কোথায় ঘুরবে ?

ডরোথি বলল, "একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে পারি না ?"

"তা পারি। কিন্তু সেটা বেশ এক্সপেন্সিভ হবে।"

ডরোথি হাসল, "তুমি ভুলে যাচ্ছ আমাদের এক পাউন্ড মানে তোমাদের আটচল্লিশ টাকার সমান। ইন্ডিয়াতে এসে মনেই হয় না পয়সা খরচ হচ্ছে।"

শুনতে মোটেই ভাল লাগল না, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি ; ইংল্যান্ড তার প্রায় সমস্ত কলোনি হারিয়েও যে অর্থনৈতিক কাঠামো ধরে

রেখেছে। তার সঙ্গে কবে যে ভারতবর্ষ পাল্লা দিতে পারবে ! বাংলো থেকে বেরিয়ে ডরোথিকে নিয়ে একটা রিকশাতে উঠল অর্জুন। খানিকটা যেতেই সে দেখল একটা কালো অ্যাম্বাসাডার তাদের পাশ কাটিয়ে বাংলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গেস্ট হাউসে তো অতিথিরা আসবেই।

রিকশায় বসে অর্জুনের মনে হল, জলপাইগুড়ি শহরে কাউকে দেখানোর মতো দ্রষ্টব্য জিনিস কিছু নেই। ওই জুবিলি পার্ক অথবা রাজবাড়ির দিঘি এখন এত হতশ্রী যে, বিদেশিনী দূরের কথা, কলকাতার মানুষও মুখ তুলে চাইবে না। অথচ তার নিজের কাছে পোস্ট অফিসের মোড়, করলা নদীর পাশ দিয়ে থানায় যাওয়ার রাস্তাকে কত মোলায়েম মনে হয়। জীবনদার বই-এর দোকানে সে পুরোটা দিন কাটিয়ে দিতে পারে। এ সবই নিজের জন্য। সে ডরোথিকে বলল, "এই শহরটা খুবই সাধারণ।"

www.boiRboi.blogspot.com

আসলে সে আটপৌরে শব্দটা ব্যবহার করতে চেয়েছিল, কিন্তু ইংরেজিতে প্রতিশব্দ না জানা থাকায় সিম্পল বলতে বাধ্য হয়েছিল। ডরোথি মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। আমার খুব অদ্ভুত লাগছে। বেঁচে থাকাটা কেমন অদ্ভুত ধরনের !"

তোমার কাছে যতই অদ্ভুত লাগুক, আমরা ভাল আছি, মনে মনে বলল অর্জুন। সে লক্ষ করছিল, পথচারীরা বারংবার রিকশার দিকে তাকাচ্ছে। একজন বিদেশিনীকে তার পাশে বসে থাকতে দেখে বেশ অবাক হচ্ছে সবাই ! এই মফস্বল শহরে বিদেশিনীকে কেউ রিকশায় চেপে ঘুরতে দেখে না। তারা এই শহরে বড় একটা আসে না। কিন্তু এখন এইভাবে দেখতে চাওয়াটা প্রায় হ্যাংলামোর পর্যায়ে চলে যাচ্ছে তা এখানকার মানুষের খেয়ালে থাকে না।

গ্যারাজের সামনে পৌঁছে সুখবর পেল অর্জুন। তার বাইক

ঠিক করে ফেলেছে মেকানিক। তৎক্ষণাৎ রিকশা ছেড়ে দিল সে। লাল বাইকটা বের করে ডরোথিকে বলল, “উঠে বোসো।”

“এটা তোমার ?”

“হ্যাঁ।”

বাইকে বসতে ডরোথি অভ্যস্ত। তাকে নিয়ে গোটা শহরটাকে পাক দিয়ে তিস্তা বাঁধের ওপর পৌঁছল অর্জুন। ডরোথি বলল, “এ কী রকম নদী, যাতে জল নেই ?”

“বর্ষাকালে দেখলে ভয় পাবে। পাহাড়ি নদীর চেহারা ঋতু অনুযায়ী পালটায়।”

“নদীর ওপারে কী ?”

“ডুয়ার্স।”

“হ্যাঁ, এই নামটা ঠাকুরদার ডায়েরিতে পড়েছি।”

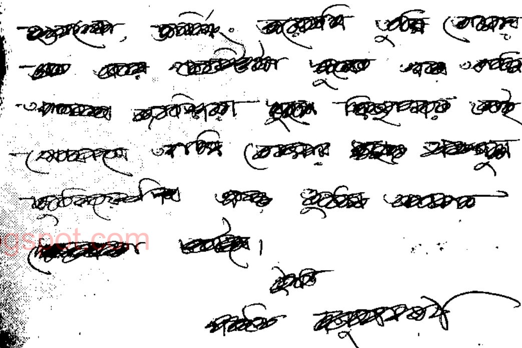

www.boiRboi.blogspot.com

চারটে বেজে গিয়েছিল। ডরোথিকে নিয়ে বাবুপাড়ায় চলে এল অর্জুন। এই শহরের অনেকেই বিপ্লবী কমলাকান্ত রায়ের বাড়ি চেনে। পুরনো ধাঁচের বাড়ি, এ-মহল সে-মহল। কমলাকান্ত রায় বিত্তবান মানুষ ছিলেন। এখন সিমেন্টের গেট আছে, কিন্তু তাতে আগল নেই। ভেতরে ঢুকে বাইক বন্ধ করতেই একটি অল্পবয়সী ছেলে বেরিয়ে এল। সে যে অর্জুনকে চিনতে পেরেছে তা বোঝা যাচ্ছিল তার মুখের হাসি দেখে। কাছে এসে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি ?"

"তুমি এখানে থাকো ?"

"হ্যাঁ। আমাদের বাড়ি।"

"কমলাকান্ত রায় তোমার কে হন ?"

"বুড়ো দাদু, মানে আমার বাবার ঠাকুরদা। আসুন না ভেতরে।" ছেলেটি ওদের বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। কয়েকটা আসবাব, বেশ পুরনো ধাঁচের, জলপাইগুলির সাবেকি বাড়িগুলোয় যেমন দেখা যায়, এই বসার ঘরও তেমনই।

চেয়ারে বসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোমার বুড়ো দাদু কবে মারা গিয়েছেন ?"

"অনেক আগে। আপনি ওঁর সম্পর্কে জানতে চান ?"

অর্জুন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতেই ছেলেটা ভেতরে চলে গেল। এতক্ষণ কথা হচ্ছিল বাংলায়। ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "কী বলল ?"

"এই ছেলেটি কমলা রায়ের গ্রেট গ্র্যান্ডসন। কমলাকান্ত মারা গিয়েছেন অনেকদিন আগে।" অর্জুন হাসল, "তুমি বড় দেরিতে এখানে এলে !"

"বেটার লেট দ্যান নেভার।" ডরোথি কাঁধ নাচাল।

এই সময় ছেলেটি এক বৃদ্ধকে নিয়ে ফিরে এল। অর্জুন উঠে

দাঁড়াল, দেখাদেখি ডরোথিও। নমস্কার জানিয়ে অর্জুন নিজের পরিচয় দিল। ছেলেটি বলল, "আমার দাদু।"

ভদ্রলোক ওদের বসতে বললেন। ফরসা, রোগা, কিন্তু অভিজাত চেহারা। বললেন, "আমি আপনার নাম শুনেছি। কী দরকার বলুন ?"

অর্জুন ডরোথির পরিচয় দিল, "ইনি ডরোথি। লন্ডন থেকে এসেছেন। ডরোথি, ইনি মিস্টার রায়, ওঁর বাবার নাম কমলাকান্ত রায়।"

ডরোথি মাথা নাড়ল। বোঝা যাচ্ছিল সে একটু অস্বস্তিতে রয়েছে।

অর্জুন বলল, "আমার সঙ্গে ওর পরিচয় আজকেই। ওর ঠাকুরদা এক সময় এই শহরে ছিলেন। বাকিটা আপনি ওর কাছেই শুনুন।" ইচ্ছে করেই এই কথাগুলো সে ইংরেজিতে বলল, যাতে ডরোথি বুঝতে পারে।

www.boiRboi.blogspot.com

ডরোথি বলল, "মিস্টার রায়, ব্যাপারটা খুব অস্বস্তিকর কিন্তু আমি আমার ঠাকুরদার শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করতে এসেছি। আপনার বাবা এখন জীবিত নেই, তাই আপনার কাছে আমি তাঁর হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

বৃদ্ধ বললেন, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কেন ক্ষমা চাইতে এসেছেন ? আপনার ঠাকুরদার নাম কী ?"

"রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড।"

"আচ্ছা ! অদ্ভুত ব্যাপার !" বৃদ্ধ সোজা হয়ে বসলেন।

ডরোথি বলল, "ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী হিসেবে ঠাকুরদাকে অনেক কাজ করতে হত। আমি তাঁর ডায়েরিতে পড়েছি, আপনার বাবা ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁকে বিরত করতে উনি প্রচণ্ড অত্যাচার করেছিলেন।

সেই সময় তাঁর বয়স ছিল অল্প। পরে এ-নিয়ে তিনি খুব অনুশোচনা করতেন।"

"ম্যাকসাহেব অনুশোচনা করতেন? এটাও অদ্ভুত ব্যাপার।" বৃদ্ধ বললেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড সম্পর্কে কিছু জানেন?"

"জানি। তখন আমি প্রায় যুবক। বিপ্লবীরা ওকে হায়েনার মতো ঘৃণা করত। বাগে পেলে উনি চোরকে ছেড়ে দিতেন, কিন্তু বিপ্লবীকে নয়। আমার বাবার ডান হাত আর ডান পা উনি চিরকালের মতো অকেজো করে দিয়েছিলেন।

ডরোথি মাথা নামাল। কথাবার্তা হচ্ছিল ইংরেজিতে। ওর কথা মনে রেখে।

বৃদ্ধ বললেন, "উনিশশো চৌত্রিশে রায়কতপাড়ার নির্মল চক্রবর্তী পিস্তল সমেত গ্রেফতার হন। ওঁর সঙ্গে শচীন বোস আর শঙ্কর সান্যাল। এঁদের ওপর কী পরিমাণ অত্যাচার হয়েছে, তা বলার নয়! ম্যাকসাহেবের অত্যাচার চলেছিল উনচল্লিশ পর্যন্ত। ওই বছরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস বসল জলপাইগুড়িতে। চারু সান্যাল, খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে পাণ্ডাপাড়ার সেই বিশাল অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি স্লোগান তুলেছিলেন, ইংরেজ ভারত ছাড়ো। ওই অধিবেশনের পরই ম্যাকসাহেব বদলি হলেন এখান থেকে। যা হোক, এ সব অনেক দিনের কথা। তোমার ঠাকুরদাকে আমরা ঘৃণা করতাম। কিন্তু সময় তো সব স্মৃতির ওপর পলিমাটি ফেলে। এখন শুধু খারাপ লাগাটা আছে, কিন্তু সেই জ্বালাটা নেই। ম্যাকসাহেবের তো বেঁচে থাকার কথা নয়!"

ডরোথি বলল, "না, উনি বেঁচে নেই।"

"তুমি ওর হয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছ?"

"হ্যাঁ। শেষ বয়সে ওঁর অনুশোচনা হয়েছিল।"

"আমি আর কী করতে পারি! এখন ক্ষমা করা আর না-করার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। অতদূর থেকে এসে তুমি আমাকে কথাগুলো বললে, শুধু এর জন্যে ধন্যবাদ।" বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। এ-ব্যাপারে আর কথা বলতে চাইছেন না, তা বুঝতে পারা গেল।

ডরোথি বলল, "আমি আপনার সেন্টিমেন্ট বুঝতে পারছি। আমার কোনও ব্যক্তিগত দায় ছিল না এখানে আসার, কিন্তু ঠাকুরদার ডায়েরি পড়ে আমি সেন্টিমেন্টাল কারণেই এত দূরে এসেছি। আচ্ছা, আমি কি মিস্টার রায় সম্পর্কে কিছু জানতে পারি না আপনার কাছে?"

বৃদ্ধ তাকালেন। তাঁর মুখের চেহারা নরম হয়ে এল। নাতির দিকে তাকিয়ে বাংলায় বললেন, "ভেতরে গিয়ে এঁদের জন্যে জলখাবারের ব্যবস্থা করতে বলো।"

www.boiRboi.blogspot.com

অর্জুন বাধা দিল। "আমরা খানিক আগে ভাত খেয়েছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

বৃদ্ধ ডরোথির দিকে তাকালেন, "তুমি আমাদের পারিবারিক শত্রুর নাতনি হতে পারো, কিন্তু বাড়িতে যখন এসেছ তখন কিছু খেয়ে যেতে হবে। চা, কফি, না সরবত?"

ডরোথি হাসল, "টি উইদাউট মিল্ক অ্যান্ড সুগার।"

ছেলেটি চলে গেল ভেতরে। বৃদ্ধ বললেন, "আমার বাবা কমলাকান্ত রায় কংগ্রেস করতেন। শশিকুমার নিয়োগী, তারিণীপ্রসাদ রায়রা উনিশশো সাত সালে ব্রিটিশ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে আর্য নাট্য সমাজে জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। সত্যেন বিশ্বাস, মহেন্দ্র ঘটক, হরেন ভৌমিকরা ছিলেন ওই

বিদ্যালয়ের ছাত্র। এঁরা পরে জলপাইগুড়িতে বিখ্যাত হন। বাবা কিছুদিন ওই বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর যজ্ঞেশ্বর সান্যাল যখন জাপান থেকে কাপড় বোনা শিখে এসে শিল্পসমিতি পাড়ায় বিলিতি বস্ত্রের পালটা দিশি বস্ত্র তৈরিতে নামলেন, তখন বাবা ওঁর সঙ্গে যোগ দেন। উনিশশো কুড়ি সাল থেকে বাবা গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। বাবাকে প্রথম গ্রেফতার করা হল উনিশশো তিরিশে। তখন আইন অমান্য আন্দোলন চলছে, বিজয়া দশমীর দিন করলার দু'পাশে মানুষের ভিড়। সবাই ভাসান দেখছে। প্রতিমা নিয়ে নৌকো চলছে। সঙ্গে আর-একটি নৌকো। সেই নৌকো থেকে স্লোগান উঠছিল, "বিলিতি জিনিস বয়কট করো, "মাদকদ্রব্য বর্জন করো।" পুলিশ সেই ভাসানের নৌকোর ওপর আক্রমণ করল। বীরেন্দ্র দত্ত, চারু সান্যাল মশাইদের সঙ্গে বাবাও গ্রেফতার হলেন। বাবা ছাড়া পান গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর। এর পর ওই ম্যাকসাহেব এলেন জলপাইগুড়িতে। ওঁর কানে 'বন্দেমাতরম্' শব্দটা ঢুকলেই যেন পাগল হয়ে যেতেন। কোনও রকম প্ররোচনা ছাড়াই তিনি মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ করতে বলতেন পুলিশকে। তেমন তেমন বন্দি হলে এমন অত্যাচার করতেন, যাতে সে আদালতে যেতে না পারে। আর আদালত তো ব্রিটিশদেরই ছিল। তবু মাঝে-মাঝে বিচারকের চক্ষুলজ্জা হত। সেই কারণে ম্যাকসাহেব তাঁদের বিব্রত করতে চাইতেন না। পাটগ্রামের কেশব দত্তের নাম এক কালে সবাই জানত। সাধারণ মানুষের বন্ধু ছিলেন তিনি। পাটগ্রামের বাঁশকাটায় প্রতি বছর মেলা বসত। সেই মেলায় যে জুয়া খেলা হত তাতে নিঃস্ব হয়ে যেত মানুষ। কেশব দত্ত তা বন্ধ করতে চান। ফলে পুলিশ গুলি চালায় আন্দোলনকারীদের ওপর। একজন নিহত হন। বাবা এর প্রতিবাদে অনশন শুরু

করলে ম্যাকসাহেব তাঁকে নিষেধ করেন। বাবা সেই নিষেধে কর্ণপাত না করায় এক মাঝরাত্রে পুলিশ বাবাকে তুলে নিয়ে যায়। তিনদিন বাবার কোনও খোঁজ পাই না। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন কৃষক বাবাকে অর্ধমৃত অবস্থায় বার্নিশে নিয়ে আসে। সুস্থ হয়ে কথা বলতে ওঁর দু' সপ্তাহ সময় লাগে। ওই তিনদিন তিস্তার ওপারে একটা পোড়ো বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল। রোজ রাত্রে ম্যাকসাহেব যেতেন তাঁর কাছে। যতরকমের অত্যাচার করা সম্ভব, তিনি তা করেছেন বাবার ওপরে। বাবা আর ভালভাবে হাঁটাচলা বাকি জীবনে করতে পারেননি।" বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করলেন।

ডরোথি চুপচাপ শুনছিল। এবার জিজ্ঞেস করল, "ওই জায়গায় কি নৌকো করে যেতে হয়?"

"নৌকো? হ্যাঁ। তখন নৌকো ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। তিস্তার ওপর তখন ব্রিজ বানাবার কথা কেউ ভাবত না।"

www.boiRboi.blogspot.com

"ওই পোড়ো বাড়িটা যেখানে ছিল, সেই জায়গাটার নাম কী?"

"দো মহনি। বার্নিশের কাছেই। কিন্তু এখন বাড়িটার কিছু অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না। যা হোক, ম্যাকসাহেবের নাতনি হওয়া সত্ত্বেও তোমার মধ্যে যে মানবতাবোধ দেখতে পাচ্ছি তাতে আমি খুশি। আমার পরিবারের সবাইকে আমি তোমার কথা বলব।"

অর্জুন উঠে পড়ল। দেখাদেখি ডরোথিও।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনি দেবদাস মিত্র নামে রায়কতপাড়ার কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীকে চেনেন?"

"নিশ্চয়ই। উনি বাবারই সহকর্মী।"

"উনি এখন— ?"

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ, "না। দেবদাসকাকু অনেকদিন আগে মারা গিয়েছেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর ভাইরা বিষয়সম্পত্তি ফ্লাডের পর বিক্রি করে দিয়ে কলকাতার দিকে চলে গিয়েছেন। কোথায় গিয়েছেন তা জানা নেই।"

অর্জুন খুশি হল। তালিকা থেকে একটি নাম কাটা গেল।

বাইরে বেরিয়ে ডরোথি কথা বলেনি। ওর মুখ বেশ বিমর্ষ। অর্জুনের মনে হয়েছিল এটা খুবই স্বাভাবিক, নিজের পূর্বপুরুষের ওইরকম কীর্তির কথা শুনলে কারও মন ভাল থাকতে পারে না। বাইকে ওঠার পর খেয়াল হয়েছিল তৃতীয় নাম, তারিণী সেনের কথা জিজ্ঞেস করা হল না বৃদ্ধকে। তারিণী সেনের হদিস পেলে ডরোথির আর এখানে থাকার দরকার হত না।

এখন ছায়া ঘন হচ্ছে জলপাইগুড়ির রাস্তায়। রিকশার ভিড় বাড়ছে। তবু এখনও এই শহরে বুক ভরে নির্মল বাতাস নেওয়া যায়। পোস্ট অফিসের মোড় পেরিয়ে তিস্তা ভবনের দিকে যেতে-যেতে অর্জুনের মনে এল কথাটা। ডরোথিকে একা রাত্রে থাকতে হবে তিস্তা ভবনে। যদিও এখন পর্যন্ত কোনও দুর্নাম নেই, তবু কোনও মেয়ের পক্ষে একা থাকা কি ঠিক! এক্ষেত্রে সে কী করতে পারে? তিস্তা ভবনে গিয়ে সে থাকতে পারে না। বরং ডরোথি যদি তাদের বাড়িতে গিয়ে থাকে—।

তিস্তা ভবনে পৌঁছে অর্জুন ডরোথিকে তার ভাবনার কথা জানাল।

ডরোথি হাসল, "তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি লন্ডন থেকে একা তোমাদের দেশে এসেছি। আমি জানি কীভাবে নিজেকে নিরাপদে, রাখতে হয়।"

অর্জুন তাকাল। হ্যাঁ, ডরোথির স্বাস্থ্য ভাল। কিন্তু এতটা অহঙ্কার করা উচিত কি? খালি হাতে ক'জনের সঙ্গে মোকাবিলা

করা সম্ভব? কিন্তু বলতে হবে, মেয়েটার সাহস আছে। সে জানল ডরোথি আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে ডিনার খায় এবং ওই সময়ের মধ্যে ফিরে আসবে কথা দিয়ে বেরিয়ে এল।

জলপাইগুড়িতে সন্ধের মুখে এখনও অনেক বাড়িতে শাঁখ বাজে। তার শব্দ শুনতে বেশ ভালই লাগে। এখন শঙ্খধ্বনি শুনতে-শুনতে সে বাইকে চেপে পাহাড়ি পাড়ায় সুধীর মৈত্রের বাড়িতে চলে এল। সুধীরবাবু অর্জুনকে দেখে খুশি হলেন। ভদ্রলোকের সামনে অনেক বই ছড়ানো। বললেন, "এসো, এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম। এই রিচার্ডসাহেব তো বেশ কৃতী পুরুষ দেখছি।"

অর্জুন বসল। চশমা খুললেন সুধীরবাবু। "সমস্ত দেশের তুলনায় জলপাইগুড়িতে স্বাধীনতা আন্দোলন কিন্তু অনেক পরে শুরু হয়। এখানকার জেলা কংগ্রেসের জন্ম উনিশশো কুড়ি সালে। ওই সময়টা ধরলে মাত্র সাতাশ বছর পরে দেশ স্বাধীন হয়। তাই ইংরেজ সরকার প্রথম দিকে জলপাইগুড়ি নিয়ে আদৌ দুশ্চিন্তায় ছিলেন না। এখানে তাই দুঁদে ব্রিটিশ অফিসারকে পাঠানোর প্রয়োজন বোধ করেননি তাঁরা। উনিশশো বত্রিশ সাল থেকে এ-জেলায় আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। তখন যেসব ব্রিটিশ অফিসারকে আমি জেলা গেজেটিয়ারে পাই তাঁদের মধ্যে রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড আছেন। তাঁর কাজ ছিল স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করা এবং তিনি সেটা করতে চেষ্টা করেছেন। তখন জেলার বেশির ভাগ চা-বাগানগুলোর ম্যানেজার সাদা চামড়ার মানুষ। রিচার্ডসাহেব এঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। তিস্তা পেরিয়ে হানা দিতেন স্বদেশীদের আড্ডায়। একটা সময় লোকে তাঁকে ম্যাকসাহেব বলে ডাকতে লাগল। ম্যাকসাহেবের মুখে পড়া মানে হায়েনার গলায় হাত দেওয়া। লোকটার কিন্তু একটা গুণ

www.boiRboi.blogspot.com

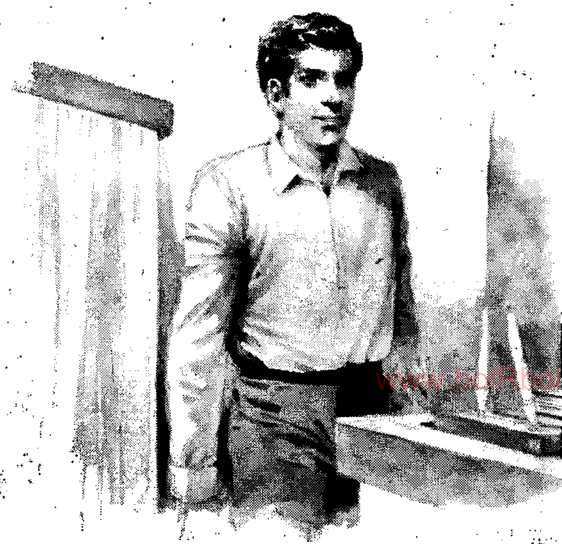

www.boiRboi.blogspot.com

ছিল। কাউকে প্রাণে মেরে ফেলত না, শুধু অকেজো করে দিত সারাজীবনের মতো।" সুধীরবাবু আবার চশমা পরলেন, "একটা তথ্য পেয়েছি এবং সেটা সামান্য অদ্ভুত। দিশি ঠাকুর-দেবতাদের সম্পর্কে অনেক বিদেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ম্যাকসাহেবের চরিত্র যা ছিল, তাতে তিনি কেন জল্পেশের মন্দির

সম্পর্কে আগ্রহী হবেন বুঝতে পারছি না।"

"কীরকম আগ্রহী হয়েছিলেন?"

"এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে ভদ্রলোক প্রায়ই বার্নিশ, দোমহনি এবং জল্পেশ অঞ্চলে যাতায়াত করতেন। তখন তিস্তার ওপর ব্রিজ ছিল না। নৌকোয় গাড়ি নিয়ে নদী পার হওয়া বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু তাঁর উৎসাহ কম ছিল না। অথচ এই অঞ্চলে দীর্ঘকাল থাকাকালীন তাঁর জল্পেশ সম্পর্কে কোনও

উৎসাহ ছিল না, হল যাওয়ার আগে। কমলাকান্ত রায়ের ওপর তিনি অত্যাচার করেছিলেন ওই অঞ্চলে নিয়ে গিয়ে। দেবদাস মিত্রকে মৃতপ্রায় অবস্থায় পাওয়া যায় বার্নিশে। অথচ এ সবের কোনও কারণ ছিল না। ম্যাকসাহেব স্বচ্ছন্দে নিজের বাংলোতেই কর্মটি সারতে পারতেন।"

"দেবদাস মিত্র তো স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন!"

"হ্যাঁ। ডেডিকেটেড মানুষ। প্রথমে মহাত্মা গান্ধী, পরে সুভাষচন্দ্রের অনুগামী হন। জেলার আধিয়ার আন্দোলনের শরিক ছিলেন একসময়। আর তখনই ম্যাকসাহেবের কুনজরে পড়েন। আধিয়ার কাদের বলে জানো?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "কৃষকদের।"

সুধীরবাবু বললেন, "উত্তরবঙ্গের গ্রামের মানুষদের অধিকাংশই জমির মালিক ছিল না। জোতদারের জমিতে চাষ করে উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক পেত তারা। এই কারণে তাদের আধিয়ার বলা হত। ওই অর্ধেক ফসলে তাদের সারা বছর চলত না। ফলে ধার করতে হত। তার ওপর নানা রকম কর দিতে হত গরিব মানুষগুলোকে। উনিশশো আটত্রিশ সালে জেলা কংগ্রেসের বামপন্থী মানসিকতার মানুষরা কৃষক সংগঠনী সমিতি গঠন করেন। দেবদাসবাবু ওই সংগঠনের পক্ষে কৃষকদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। হাটে-হাটে লিফলেট বিলি করা হয় কৃষকদের একত্রিত করতে। এদের নেতৃত্বে আসেন কংগ্রেস কর্মী মাধব দত্ত। কৃষকদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ইংরেজরা মনে করল সমিতি কৃষকদের সংগঠিত করছে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য। কিন্তু ওই আন্দোলন মূলত অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় সীমাবদ্ধ ছিল। তবু ম্যাকসাহেব দেবদাসবাবুকে তুলে নিয়ে গেলেন এক রাত্রে। ওঁর ওপর অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়ে কৃষক সমিতিকে

চরম শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।"

"দেবদাসবাবু তো জীবিত নেই!"

"না। অনেকদিন হল চলে গেছেন। স্বাধীনতার পরেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন।"

"আচ্ছা, আপনি তারিণী সেন নামে কাউকে জানেন?"

সুধীর মৈত্র সোজাসুজি তাকালেন, "কোন তারিণী সেন?"

"স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিক।"

"এই জেলায় ওই নামে কেউ ছিলেন বলে শুনিনি। অন্তত স্বাধীনতা আন্দোলনে এমন নামের মানুষ কোনও উল্লেখযোগ্য কিছু করেননি।" মাথা নাড়লেন সুধীরবাবু।

অর্জুন অস্বস্তিতে পড়ল। সে ভেবেছিল সুধীরবাবুর কাছে তারিণী সেনের খবর পাবে। সেই মানুষটি যদি বেঁচে না থাকেন তা হলে ডরোথির কাজ শেষ হয়ে যাবে, আর থাকলে কালই যাওয়া যেত।

www.boiRboi.blogspot.com

সুধীরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তারিণী সেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামী, তা তোমাকে কে বলল?"

"কেউ বলেনি, আমি অনুমান করেছিলাম।"

"হঠাৎ এরকম অনুমান করার অর্থ?"

অর্জুন বলল, "ডরোথি, মানে ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের নাতনি, ওর দাদুর ডায়েরিতে যে তিনজনের নাম পড়ে এখানে এসেছে, তাদের শেষজন হলেন এই তারিণী সেন। তাই আমি ভেবেছিলাম কমলাকান্ত রায় অথবা দেবদাস মিত্রের মতো তারিণী সেনও স্বাধীনতা সংগ্রামী।"

সুধীরবাবু বললেন, "যদি কোনও সাধারণ কর্মী থেকে থাকেন, তা হলে থাকতে পারেন। মুশকিল হল, এত বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে, তবু কংগ্রেসের তরফ থেকে আন্দোলনের সম্পূর্ণ ইতিহাস

আজও লেখা হয়নি, কেউ ভাবছে বলে জানি না। আন্দোলনকারীদের জেলাভিত্তিক একটা তালিকাও তৈরি হয়নি। কিন্তু উত্তরবঙ্গে তারিণী সেন নামে একজন ছিল, যার সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের কোনও সম্পর্ক ছিল না।"

"কোন সময়ে ?" অর্জুন কৌতূহলী হল।

সুধীরবাবু উঠলেন। বইয়ের স্তূপে হাত বোলাতে লাগলেন নিচু হয়ে। সখেদে বললেন, "ঠিক প্রয়োজনের সময় বইগুলো আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। আর..." একটু পরে হতাশ হয়ে উঠে এলেন সামনে, "খুঁজব। কোনও একটা বইয়ে ওর নাম পেয়েছিলাম। কোন সময় মনে নেই, তবে লোকটা একজন কুখ্যাত অপরাধী।"

"সে কী !"

"অবাক হচ্ছ কেন ?"

"কুখ্যাত অপরাধীর নাম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে থাকবে কেন ?"

www.boiRboi.blogspot.com

"আরে সেই লোক এই লোক কি না তা আগে দ্যাখো। তুমি বিমল হোড় মশাইয়ের কাছে যাও। উনি প্রবীণ আইনজ্ঞ। ওঁর স্মরণে থাকতে পারে। এইসব অপরাধী কখনও না কখনও শাস্তি পায়। সরকারি রেকর্ডেও নাম থাকা উচিত।" সুধীরবাবু বইয়ের স্তূপের দিকে তাকালেন, "কাল বিকেল নাগাদ এসো। আমিও খোঁজ নিচ্ছি।"

ঠিক আটটা পনেরোতে খাবার নিয়ে তিস্তা ভবনে পৌঁছে গেল অর্জুন। ডরোথি উপন্যাস পড়ছিল। অ্যালেস্টার ম্যাকলিনের থ্রিলার। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "একা সময় কাটছে না ?"

ডরোথি মাথা নাড়ল, "মোটেই না, এই বইটায় জমে আছি।"

"তুমি বেড টি খাও ?"

"না। একেবারে ব্রেকফাস্ট। তবে সেটা আমি এখানেই নেজ করে নিয়েছি। চৌকিদার বলেছে সে আমাকে টোস্ট আর মলেট বানিয়ে দেবে।"

"বাঃ, খুব ভাল।" টিফিন ক্যারিয়ারটা টেবিলের ওপর রেখে দুপুরেরটা নিয়ে নিল সঙ্গে। ডরোথি বলল, "কাল আমরা তারিণী সেনের খোঁজ করব তো ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "আমি ইতিমধ্যেই সেটা শুরু করেছি। কিন্তু একটা সমস্যা হয়েছে। ওই নামে কোনও বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না।"

"সে কী ! ওই নামে কোনও মানুষ ছিল না ?"

"ছিল। কিন্তু লোকটা একজন কুখ্যাত অপরাধী।"

চমকে তাকাল ডরোথি। তারপর মাথা নাড়ল, "আমি বিশ্বাস করি না।"

"হয়তো ওই লোকটার কথা তোমার দাদু লেখেননি। আসলে ওর সম্পর্কে তিনি ঠিক কী-কী লিখেছেন জানলে খোঁজ পেতে সুবিধে হত।"

ডরোথি একটা নোটবই বের করল। বোঝা যাচ্ছে যে তার দাদুর ডায়েরি থেকে ওখানে নোট করেছে তথ্যগুলো। সে পড়ল, "তারিণী সেন। যে লোকটা আমাকে প্রচন্ড সাহায্য করেছিল তাকে আমি শেষপর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারিনি। স্বাধীনতা এমন একটা স্বপ্নের নেশা যে-কোনও মানুষ তার লোভে পালটে যেতে পারে। আমি ওর ওপর যে অত্যাচার করেছি তার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তা না করে আমার উপায় ছিল না। এখন অনুশোচনা হচ্ছে। লোকটা হয়তো চিরকালই বিশ্বস্ত থাকত।" ডরোথি তাকাল, "ব্যস, এইটুকু।"

অর্জুন চোখ বন্ধ করে শুনছিল। এবার গম্ভীর মুখে বলল,

"লোকটা আর যেই হোক, স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিল না। ওই সময়ে কোনও ভারতীয় ইংরেজ শাসককে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলে তাকে নিশ্চয়ই স্বাধীনতা সংগ্রামী বলা হত না।"

"হয়তো। তবে এই লোকটা তো সরকারের প্রতি অনুগত হতে পারেন, দাদু তাকে ভুল বুঝেছেন বলে পরে অনুশোচনা করেছেন।"

"অনুগত ছিলেন তাতে ভুল নেই। এ দেশে তো বিশ্বাসঘাতকের অভাব নেই।"

"আমি এ-ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করব না।"

"তোমার ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি। সুধীরবাবু বলেছেন ওই নামে একজন কুখ্যাত অপরাধী ছিল। আমরা কালকে জানতে পারব লোকটা তোমার দাদুর সময়ে ছিল কি না আর কোন অঞ্চলের মানুষ!"

"সুধীর মৈত্র কে?"

"একজন পণ্ডিত মানুষ। জলপাইগুড়ির ইতিহাস ওঁর জানা। পাহাড়ি পাড়ায় থাকেন। উনি আগামীকাল আমাকে যেতে বলেছেন।"

ডরোথি কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। অর্জুনের মনে হল, এটা স্বাভাবিক। একজন কুখ্যাত অপরাধীর সঙ্গে তার দাদুর সম্পর্ক ছিল, এটা ভাবতে নিশ্চয়ই ভাল লাগছে না তার। কিছুক্ষণ কথা বলে আগামীকাল আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে নিচে নেমে এল। চৌকিদারকে ডরোথির নিরাপত্তার কথা আর-একবার মনে করিয়ে দিয়ে সে বাইকে চড়ে বসল। এদেশের বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্য পেয়েছিল বলেই ইংরেজরা দুশো বছর ধরে রাজত্ব চালিয়ে যেতে পেরেছে। বোঝা যাচ্ছে ওই রকম একজন বিশ্বাসঘাতকের নাম তারিণী সেন। ওই লোকটা কুখ্যাত

অপরাধী নাও হতে পারে। একজন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কারও অনুশোচনা হতে পারে না। অন্যমনস্ক হয়ে বাইক চালাচ্ছিল অর্জুন। হঠাৎ একটা গাড়ির জোরালো আলো মুখে পড়ায় সে হকচকিয়ে রাস্তার একপাশে সরে এল। গাড়িটা পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার পর তার মনে হল অকারণে জোরে চালাচ্ছে ড্রাইভার।

এখন শহরের রাস্তায় রাত ন'টাতেও মানুষজন রিকশায় দেখা যায়। বছর পাঁচেক আগেও সাতটার পর রিকশা উধাও হয়ে যেত। ন'টার সময় রাস্তার অবস্থা শ্মশানের মতো। অর্জুনের মনে পড়ল বিমল হোড় মশাইয়ের কথা। সুধীরবাবু ওঁর কথা বলেছিলেন। বিমল হোড় এই শহরের প্রবীণ আইনজ্ঞ। নিশ্চয়ই বয়স হয়েছে। অর্জুন তাঁকে কয়েকবার দূর থেকে দেখেছে। ভদ্রলোক হয়তো এতক্ষণে শুয়ে পড়েছেন। এই সময় গেলে বিরক্ত করা হবে। তবু অর্জুন সমাজপাড়ার দিকে বাইক নিয়ে চলল। বিভীষণ অথবা মিরজাফরদের কাহিনী জানতে মানুষের চিরকাল কৌতূহল হয়। অর্জুনেরও হচ্ছিল।

www.boiRboi.blogspot.com

বিমল হোড় মশাইয়ের বাড়িতে আলো জ্বলছিল। নিচের তলার ঘরটির সামনে দু'জন লোক কথা বলছে। একটু ইতস্তত করে অর্জুন বাইক থামিয়ে গেট খুলল। লোক দুটো ফিরে তাকাতে সে এগিয়ে গেল, "কিছু মনে করবেন না, বিমলবাবু কি এখন দেখা করতে পারেন?"

একজন জিজ্ঞেস করল, "কী দরকার?" বলেই তার খেয়াল হল, "আরে! আপনি অর্জুন না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন। বাবা অবশ্য অনেক আগে ওপরে চলে যান। আজ ল' কলেজ থেকে ফিরতে দেরি হল বলে এখনও নিচে আছেন। আসুন।"

ভদ্রলোক তাকে নিয়ে গেলেন যে ঘরে, সেটা আইনজ্ঞের ঘর

তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অর্জুন দেখল বিমলবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। ভদ্রলোক বললেন,"বাবা, ইনি অর্জুন।"

"কোন অর্জুন ?"

"ডিটেকটিভ।"

শব্দটা নিয়ে অর্জুন আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বিমলবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "আরে, এসো, এসো। বোসো। তোমার নাম শুনেছি এতকাল, চোখে দেখলাম এই প্রথম। 'তুমি' বললাম বলে রাগ কোরো না।"

"না, না। অবশ্যই বলবেন।"

"বয়সের অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছি।" বিমলবাবু বললেন, "বোসো। বলো, কী দরকার। আমার কাছে কোর্ট-কাছারির ব্যাপার না থাকলে তো কেউ সহজে আসে না!"

"পাহাড়ি পাড়ার সুধীর মৈত্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে বললেন।"

"সুধীর ? সে তো পণ্ডিত মানুষ। ব্যাপারটা কী ?"

"আপনি তারিণী সেন নামে কাউকে চেনেন ?"

"জলপাইগুড়িতে সেনবংশ ব্যাপক। কোন তারিণী সেনের কথা বলছ ?"

"রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড নামে এক সাহেবের ডায়েরিতে নামটা পাওয়া গেছে।"

"কী সাহেব ?"

"রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড।"

"নামটা শোনা-শোনা। ওহো ম্যাকসাহেব! ভয়ঙ্কর লোক। আজকাল বয়সের দোষে সব সময় স্মরণশক্তি কাজ করতে চায় না। তা, ওঁর ডায়েরিতে নামটা পাওয়া গিয়েছে ?"

"হ্যাঁ।"

"তারিণী সেন।" চোখ বন্ধ করলেন বিমলবাবু। সম্ভবত স্মৃতি হাতড়াচ্ছিলেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য অর্জুন বলল, "মনে হচ্ছে লোকটা বিশ্বাসঘাতক ছিল।"

চোখ খুললেন বিমলবাবু, "ইয়েস, মনে পড়েছে। লোকটা ছিল কুখ্যাত ডাকাত। ওই ময়নাগুড়ি অঞ্চলে ওর ভয়ে মানুষ শিউরে থাকত। লোকটাকে অ্যারেস্ট করা হয়; সেটা নাইনটিন থার্টি এইট, হ্যাঁ, ওই বছরই। তার পরের বছর খগেনদা, ধীরাজদা, শশাদারা জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন করেন। সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু আর প্রধান অতিথি সুভাষচন্দ্র। 'ইংরেজ, ভারত ছাড়ো' ধ্বনিটি ওখানেই ঘোষিত হয়। এর ঠিক আগের বছর তারিণীকে গ্রেফতার করে আনে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে চার্জ ছিল, খুন-ডাকাতি-রাহাজানির। অন্তত গোটা দশেক খুন করেছিল লোকটা।"

www.boiRboi.blogspot.com

"বিচারে কী শাস্তি হয়েছিল ?"

"বিচার হয়নি।"

"তার মানে ?"

"পুলিশ সাক্ষী দেওয়ার জন্যে একটা মানুষকেও জোগাড় করতে পারেনি। ওর ভয়ে কেউ মুখ খুলতে চায়নি। বংশী বর্মণ নামে দোমহনির একজন শিক্ষক পুলিশকে জানিয়েছিলেন, তিনি সাক্ষী দিতে চান। কিন্তু তার পরদিনই বংশীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। আর তার পর থেকে সমস্ত সাক্ষী উধাও। প্রমাণাভাবে ছাড়া পেয়ে যায় তারিণী। শুনেছি, এ-ব্যাপারে নাকি ম্যাকসাহেবের একটা বড় ভূমিকা ছিল।"

"তারিণী সেন তার পরেও ডাকাতি করত ?"

"না। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের খবর

সে ইংরেজদের কাছে পৌঁছে দিত। ময়নাগুড়ি থেকে দোমহনি পর্যন্ত যে এলাকা, সেটা যেন ওর সম্পত্তি ছিল। টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াত সে। কিন্তু মানুষ তার অন্যায়ের শাস্তি পাবেই। তারিণীও পেয়েছিল। তাকে জলপাইগুড়ির হাসপাতালে আনা হয়েছিল প্রচন্ড আহত অবস্থায়। দুটো হাত কেউ কেটে নিয়ে গিয়েছে। প্রচন্ড প্রাণশক্তি থাকায় রক্তপাত হলেও বেঁচে গিয়েছিল সে। কিন্তু পুলিশের কাছে শুনেছি কোনও জবানবন্দী দেয়নি।"

"কেন?"

"জানি না। তার পর লোকটার কোনও খবর জানি না।"

"তারিণী সেন নিশ্চয়ই বেঁচে নেই?"

"বেঁচে থাকলে আশির ওপর বয়স হবে।"

"আপনি বললেন ওর দুটো হাত কেটে ফেলা হয়েছিল!"

"হ্যাঁ। সুস্থ হলেও ওই অবস্থায় কতদিন বেঁচে থাকা যায়, জানি না। কিন্তু তুমি ওর সম্পর্কে এত ইন্টারেস্টেড কেন?"

"আমি নই। একজন বিদেশিনী লোকটার সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু মনে হচ্ছে ওর এতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকা একটু অস্বাভাবিক!"

বিমল হোড় বললেন, "তুমি একটা কাজ করতে পারো। ময়নাগুড়িতে আমার এক পুরনো মক্কেল থাকেন। অবস্থাপন্ন পরিবার। ভদ্রলোকের নাম হরিদাস বর্মন। ময়নাগুড়ির মোড় থেকে নাটাগুড়ির দিকে যাওয়ার পথেই ওঁর বাড়ি। সবাই চেনে। ওঁর কাছে যেতে পারো। আমার নাম করলে হরিদাসবাবু তোমাকে সাহায্য করবেন। উনিই বলতে পারবেন, তারিণী সেন বেঁচে আছে কি না!"

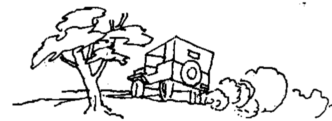

www.boiRboi.blogspot.com

আজ ঘুম ভেঙে গেল সাতসকালে। একটু আলস্য লাগছিল বলে অর্জুন মর্নিং ওয়াকে বের হল না। বিছানায় শুয়ে ডরোথির কথা ভাবল সে। কাল রাত্রে মেয়েটা ঠিকঠাক ছিল কিনা খোঁজ নিতে হবে। অমল সোম যখন তার কাছে পাঠিয়েছেন তখন একটা দায়িত্ব তো থাকছেই। তারপর তারিণী সেনের কথা মনে এল। কমলাকান্ত রায় অথবা দেবদাস মিত্রের চেয়ে তারিণী সেন অনেক বেশি আকর্ষক চরিত্র।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এই তারিণী সেন অপরাধী ছিল। কুখ্যাত ডাকাত। তার কাছে ক্ষমা চাইবেন কেন রিচার্ডসাহেব? এই লোকটি তাই রিচার্ডসাহেবের ডায়েরিতে লেখা লোক নাও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, অমন কুখ্যাত মানুষের বিরুদ্ধে যখন সাক্ষ্য দেওয়ার মানুষ পাওয়া যায়নি, তখন তার দুটো হাত কেটে ফেলার সাহস কে দেখাবে? বিপ্লবীরা বদলা নেয়নি তো? দোমহনি থেকে ময়নাগুড়ি অঞ্চলটায় সে ঘুরে বেড়াত! ডাকাতি ছেড়ে দেওয়ার পর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের খবর সাহেবদের দিত। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু এ সবের সঙ্গে রিচার্ড সাহেবের সম্পর্ক কোথায়? তবু, এত বছর পরেও চরিত্রটা তাকে টানছে। অর্জুন ঠিক করল সে ময়নাগুলিতে গিয়ে হরিদাস বর্মণের সঙ্গে দেখা করবে।

মা ঘরে ঢুকলেন, "কী রে, শরীর খারাপ নাকি?"

অর্জুন হাসল, "না। আরাম করছি।"

"তোকে এক ভদ্রলোক ডাকছেন। ওঠ।"

"কে ?"

"নাম জিজ্ঞেস করিনি। বয়স্ক মানুষ। সেই মেয়েটার জন্যে জলখাবার করে দিচ্ছি। হ্যাঁ রে, আমার রান্না ওর পছন্দ হয়েছে তো ?"

অর্জুন বিছানা থেকে নামল, "খুব। তবে জলখাবার লাগবে না। ওখানেই ব্যবস্থা হয়েছে।" সে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে গেল।

বাইরের ঘরে এসে অর্জুন অবাক ! সুধীর মৈত্র বসে আছেন। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ভদ্রলোক খুব বিচলিত। সে জিজ্ঞেস করল, "এ কী, আপনি ?"

"আসতে হল। খোঁজ খবর নিয়ে চলে এলাম। খুব সমস্যা— ।"

"বলুন !"

"কাল মাঝরাতে দু'জন লোক এসেছিল বাড়িতে।"

"মাঝরাত্রে ?"

"হ্যাঁ। তখন প্রায় বারোটা। আমি অবশ্য জেগে ছিলাম। হারু সান্যাল মশাইয়ের 'দি রাজবংশীস অফ নর্থবেঙ্গল' বইটা আবার পড়ছিলাম। আটষট্টি সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিল বইটা। এই সময় ওরা দরজায় নক করল।"

"তারপর ?"

"আমি বেশ বিরক্ত হয়েছিলাম। ওরা ক্ষমা চেয়েছিল। অনেক কষ্ট করে আমার সন্ধান পেয়ে শিলিগুড়ি থেকে এসেছে ওরা। তারিণী সেন নামে কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীর কথা আমি জানি কি না তা ওরা জানতে চেয়েছিল।"

"সে কী ?" অর্জুন চমকে উঠল।

"হ্যাঁ। আমিও অবাক হয়ে যাই। এত বছরে কেউ আমাকে ওই প্রশ্ন করেনি। আর একই দিনে দু'জন, তুমি এবং ওরা, তারিণী সেনের খবর জানতে চাইল। বুঝলাম এর পেছনে রহস্য আছে। তুমি জলপাইগুড়ির ছেলে। আমার কাছে আশা করব মিথ্যে কথা বলবে না। তারিণী সেন সম্পর্কে যারা আগ্রহী, তাদের মতলব ভাল হতে পারে না।"

অর্জুন ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, "আমি আপনার কাছে সত্যি কথা বলেছি। ওই বিদেশিনী আমাকে বলেছেন যে, তাঁর দাদু তিনজন মানুষের নাম ডায়েরিতে লিখে গেছেন যাঁদের কাছে ক্ষমা চাইতে তিনি এদেশে এসেছেন।"

"তুমি এটা বিশ্বাস করছ ?"

"এখনও অবিশ্বাস করার মতো কোনও কারণ ঘটেনি। অবশ্য শুনলে একটু অবাক হতেই হয়। তবে মানুষ তো অনেক অদ্ভুত কাণ্ড করে।"

www.boiRboi.blogspot.com

"কাল রাত্রে লোক দুটোকে আমি কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম। ওরা বলল তারিণী সেনের কাহিনী ভাসা-ভাসা শুনে মনে হয়েছে ভাল সিনেমা করা যায়। কিন্তু আরও বিস্তৃত জানার জন্যে লোকটার কাছে যাওয়া দরকার বলেই এসেছে।"

"আপনি বললেন ওরা শিলিগুড়ি থেকে এসেছিল।"

"তাই বলেছে।"

"বাঙালি ?"

"একজন বাঙালি, অন্যজন নয়। তার কথা জিজ্ঞেস করিনি।"

"তার পর ?"

"আমি যখন জানালাম ওই নামের কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীকে চিনি না, তখন ওরা কিছুক্ষণ শক্ত মুখে বসে রইল।

শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়জন ইংরেজিতে প্রশ্ন করল, "স্বাধীনতার আগে যে তারিণী সেনের নাম আপনি জানেন, তার কথা বলুন।"

আমি খুব রেগে গেলাম। এত রাত্রে যেচে বাড়িতে ঢুকে ওরা যেন আমাকে আদেশ করছে। আমি কিছু বলতে অস্বীকার করলাম। বাঙালিটি বলল, "আপনি এত রাগ করছেন কেন? আপনি বলুন এবং তার জন্যে পারিশ্রমিক পাবেন।"

কথাটা শুনে আমি এত রেগে গিয়েছিলাম যে, ওরা আর অপেক্ষা করেনি। আমি রাত্রে ভাল করে ঘুমাতে পারিনি। এই লোকগুলোর অ্যাটিচুড মোটেই ভাল নয়। তুমি না-হয় ম্যাক সাহেবের নাতনির অনুরোধে তারিণী সম্পর্কে জানতে আমার কাছে এসেছিলে, কিন্তু ওরা এল কেন? আমার কাছে কে পাঠাল?"

"আমাকে সন্তুদা বলেছিলেন আপনার কথা।" অর্জুন বিনীত গলায় বলল।

"ওদের কে বলেছে আমার কথা? শিলিগুড়ি থেকে মাঝরাত্রে সোজা আমার বাড়ির দরজায়? আমি যেন ইনফরমেশন সেন্টার। সাইনবোর্ড টাঙিয়ে বসে আছি।" বিড়বিড় করলেন সুধীর মৈত্র।

"আপনি থানায় একটু বলে রাখুন।"

"সকালে ফোন করেছিলাম। পঞ্চাশ বছর আগের একটা মানুষ সম্পর্কে জানতে এসেছিল শুনে ওরা পাত্তাই দিল না।"

মা ভেতর থেকে ডাকতে অর্জুন ক্ষমা চেয়ে নিয়ে উঠল। চা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ট্রেতে দুধ, চিনি, চা আলাদা পটে নিয়ে ফিরল অর্জুন। সুধীর মৈত্র সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি কালো চা খাই।"

চুপচাপ চা খেলেন সুধীরবাবু। অর্জুনও কথা বলেনি। চা শেষ করে সুধীরবাবু চললেন, "লোকটাকে নিয়ে সিনেমা বানাবে! ক্রিমিন্যালদের ছবি লোকে দ্যাখে?"

"দ্যাখে। খুব অ্যাকশন থাকে তো!"

"তারিণী সেনকে পুলিশ ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে নাইনটিন থার্টি এইটে। কিন্তু কোনও শাস্তি হয়নি তার। আমি কাল এটুকুই জানতে পেরেছি।"

অর্জুন মাথা নাড়ল। সে যে বিমল হোড়ের কাছ থেকে আরও কিছু তথ্য পেয়েছে, সেটা বলল না। সুধীরবাবু উঠে দাঁড়ালেন, "আমি নিজের মনে পড়াশোনা করতে ভালবাসি, বাইরের লোক এসে ডিস্টার্ব করলে খুব অসুবিধে হয়। তা বলে ভেবো না তোমাকে আমি বাইরের লোক বলছি। চলি।"

অর্জুন ভদ্রলোককে এগিয়ে দিল খানিকটা। ফিরে আসার সময় সে বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সুধীরবাবুর বাড়িতে অত রাত্রে কারা গিয়েছিল? সন্তুদা যেভাবে তাকে সুধীরবাবুর খবর দিয়েছিল সেইভাবেই কি লোক দুটো খবর পেয়েছিল? সিনেমার ব্যাপারটা কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। তার জন্য ওরা সকালবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারত। বোঝাই যাচ্ছে, ওদের ধৈর্য ধরার মতো সময় ছিল না। কেন?

ডরোথি যেমন তারিণী সেনকে খুঁজছে ওর দাদুর শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করতে, তেমনই এদের কী কারণে একই সঙ্গে লোকটাকে দরকার হয়েছে? ব্যাপারটা যেহেতু রহস্যময়, তাই ডরোথিকে সতর্ক করে দেওয়া দরকার। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, গত রাতে যারা সুধীর মৈত্রের কাছে গিয়েছিল, তারা ডরোথির জলপাইগুড়ির আসার খবর পেয়েছে এবং কোনও অজানা ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছে।

তৈরি হয়ে বাইক নিয়ে বের হল অর্জুন। তিস্তা ভবনের গেটে পৌঁছে সে ডরোথিকে দেখতে পেল। এই সকালবেলায় নরম রোদে লনে হেঁটে বেড়াচ্ছে। পরনে হলদে ছোপ দেওয়া চমৎকার

www.boiRboi.blogspot.com

স্কার্ট। মাথায় রিবন। বয়স অনেক কম লাগছে।

"গুড মর্নিং।" অর্জুন হাসল।

"গুড মর্নিং। সত্যি, সকালটা খুব সুন্দর! ওটা কী পাখি?"

অর্জুন দেখল কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচু ডালে পাখিটা বসে আছে, "আমি ইংরেজি নাম জানি না। বাংলায় বলে নীলকণ্ঠ।"

ডরোথি মনে-মনে নামটা উচ্চারণের চেষ্টা করল, কিন্তু পাখিটা উড়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে তাকে বেশ হতাশ দেখাচ্ছিল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। ডিম সেদ্ধ, টোস্ট আর চা।"

"তোমার জন্যে একটা খবর আছে।"

ডরোথির মুখে হাসি ফুটল, "তিন নম্বরের খবর পেয়েছ?"

"কিছুটা। কিন্তু খবর হচ্ছে ওই তারিণী সেন সম্পর্কে তুমি ছাড়া আরও দু' জন মানুষ ইন্টারেস্টেড। তাঁরা ওর ওপর সিনেমা তৈরি করবেন।"

www.boiRboi.blogspot.com

ডরোথির মুখ শক্ত হয়ে গেল, "কে বলল এ-কথা?"

"ওরাই। অবশ্য আমাকে নয়। গতকাল আমি যে ভদ্রলোকের কাছে তারিণী সেনের খবর আনতে গিয়েছিলাম, তাঁর কাছেই ওরা রাত বারোটার সময় গিয়েছিল। আমার কাছে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হচ্ছে না, ওরা সুধীরবাবুর কাছেই গেল কেন? জলপাইগুড়ি শহরে অনেক বয়স্ক মানুষ আছেন যাঁরা পুরনো দিন নিয়ে কথা বলতে ভাল পারেন। তাঁদের কারও কাছে না গিয়ে ওরা— ! এটা কাকতালীয় ঘটনা বলে মনে করি না।"

ডরোথি বলল, "তোমাকে যিনি ওঁর কথা বলেছিলেন তেমনই আর-একজন ওদের একই নাম বলতে পারেন। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য তো আলাদা।"

"হ্যাঁ। তবে সেটা একই সময়ে বলে অস্বস্তি হচ্ছে। বিশেষ

করে লোকটার অতীত ভাল নয়। তারিণী সেন কুখ্যাত ডাকাত ছিল।" অর্জুন তাকাল ডরোথির দিকে। মেয়েটা পাথরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটা একটু সহজ করার জন্য সে বলল, "আসলে সত্যসন্ধান করতে-করতে এমন অভ্যেস তৈরি হয়েছে যে, কোনও কিছুকেই সহজ মনে গ্রহণ করতে পারি না।"

"তারিণী সেন কি এখনও বেঁচে আছে?" ডরোথি জিজ্ঞেস করল।

"জানি না। না থাকারই সম্ভাবনা। সময় তো কম বয়ে যায়নি।"

"উনি কোথায় থাকতেন?"

"ময়নাগুড়ি থেকে দোমহনির মধ্যে।"

"আমরা নিশ্চয়ই সেখানে গিয়ে খোঁজ করতে পারি। কত দূরে?"

"বেশি দূর নয়। তিস্তা ব্রিজ পার হলেই দোমহনি। মিনি কুড়ির পথ।"

www.boiRboi.blogspot.com

"তা হলে চলো।"

"আমি বলি কি, তুমি গেস্ট হাউসেই থাকো; আমি ঘুরে আসি।"

"না। একা থাকতে একঘেয়ে লাগছে। আমি যাব।"

অতএব ডরোথিকে পেছনের সিটে বসাতে হল। জলপাইগুড়ি শহরের রাস্তায় সাইকেল রিকশার ভিড় শুরু হয়ে গিয়েছে। টাউন ক্লাবের পাশ দিয়ে অর্জুন তিস্তা ব্রিজের পথ ধরল। রাস্তার অধিকাংশ মানুষ ঘুরে-ঘুরে তাদের দেখছে। এটা যে ডরোথির কারণে, তা বলা বাহুল্য। ডরোথি এখন রোদচশমা পরে নিয়েছে। ফলে তার মনের ভাব বোঝা সম্ভব নয়। কী রকম নির্বিকার দেখাচ্ছে।

এখন দু'পাশে ফাঁকা মাঠ, নীল আকাশ মাথার ওপর, আর চমৎকার বাতাস শরীরে আলতো আঘাত করছে। পেছনে বসে ডরোথি বলল, "কী আরাম!"

অর্জুন কিছু বলল না। তার মনে হচ্ছিল মেয়েটার বয়স নিশ্চয়ই বেশি নয়, শরীরটাই বড় হয়েছে শুধু। নইলে ওই দুটো লোককে নিয়ে সে এবং সুধীরবাবু যতটা বিচলিত হয়েছে, তার বিন্দুমাত্র ও হচ্ছে না কেন? সহজ-সরল মানুষদের সুবিধে হল দুশ্চিন্তা চট করে তাদের আঁকড়ে ধরে না, ফলে ভাল থাকে।

তিস্তা ব্রিজে টোল ট্যাক্স দিতে থামতেই হল। টিকিট নিয়ে অর্জুন বলল, "এটা হল তিস্তা নদী। এখন বেশি জল নেই বলে ভেবো না সারা বছর এইরকম চেহারা থাকে। ভরা বর্ষায় এপার-ওপার দেখা যায় না।"

ডরোথি নেমে পড়েছিল। কয়েক পা হেঁটে ব্রিজের ওপর রেলিং ধরে দাঁড়াল সে। হাওয়ায় তার পোশাক উড়ছে। বাইকটাকে দাঁড় করিয়ে অর্জুন পাশে চলে গেল, "যখন এই ব্রিজ তৈরি হয়নি তখন বর্ষাকালে নৌকোয় মানুষ এপার থেকে ওপারে যেত। প্রচুর সময় লাগত তখন। শীতকালে শুনেছি একপাশে নৌকো আর বাকিটা চরের ওপর ট্যাক্সি চলত। ওদিকটা হল বার্নিশ। কমলাকান্ত রায়কে ওখানে পাওয়া গিয়েছিল।"

ডরোথি অনেক দূরের গাছপালার দিকে তাকাল। এখান থেকে সেটা প্রায় অস্পষ্ট।

ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "আমার ঠাকুর্দাও তা হলে নৌকো করে পার হতেন?"

"নিশ্চয়ই। তখন মোটরবোট চালু হয়নি।"

আবার বাইক চালু করে অর্জুন ব্যাপারটা ভাবতে আরম্ভ করল। মায়ের কাছে সে শুনেছে তখন নদী পার হতে ঘণ্টা

দেড়েক লেগে যেত। রিচার্ড অথবা ম্যাকসাহেব প্রায়ই তিন ঘণ্টা সময় নষ্ট করে কোন কারণে বার্ণিশের দিকে যেতেন, সেটা বোধ হয় কখনও জানা যাবে না। মানুষ অকারণে এত কষ্ট করে না।

দোমহনির মোড় জমজমাটা। আগে এখারে রেল লাইন ছিল, আটষট্টির বন্যার পর ট্রেন চলে না। ডান দিকে বাইপাসের পথ ছেড়ে অর্জুন সোজা চলে এল ময়নাগুড়িতে। তেমাথার মোড়ে বাইক থামিয়ে সে জায়গাটার নাম বলল ডরোথিকে। বেশ হতশ্রী চেহারা। দোকানপাটগুলো যে সচ্ছল নয় বোঝা যায় সাজগোজ দেখে। বাইপাস হওয়ার পর থেকে ময়নাগুড়ির গুরুত্ব কমে গেছে।

ওদের দাঁড়াতে দেখে ভিড় জমে গেল। মফস্বলের বেকার মানুষেরা গোল হয়ে ঘিরে ওদের দেখতে লাগল। কালো চামড়ার মানুষের পেছনে সাদা চামড়ার এক মেমসাহেব দেখে ওরা কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল। অর্জুন এক জনকে জিজ্ঞেস করল, 'হরিদাস বর্মণকে চেনেন ?"

সঙ্গে-সঙ্গে গুঞ্জন উঠল। এরা হরিদাস বর্মণের বাড়িতে এসেছে অতএব আর কোনও কৌতূহল থাকতে পারে না, এমন ভাব। একজন জবাব দিলেন, "ওই যে রাস্তাটা, চারটে বাড়ি বাদ দিলেই ডানহাতি দোতলা বাড়ি। কোনও কাজ আছে বুঝি ?"

মফস্বলের লোকেরা প্রশ্ন করার সময় ভাবে না করাটা ঠিক কিনা। মুখ আর মনের ফারাক নেই। অর্জুন বাইক ঘোরাতেই রাস্তা করে দিল লোকগুলো। ঠিক চতুর্থ বাড়িটির সামনে পৌঁছে অর্জুন বাইক থেমে নামল।

ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "এটা কার বাড়ি ?"

"হরিদাস বর্মণ। অনেক পুরনো মানুষ। কপাল ভাল থাকলে এর কাছে খবর পাব।" অর্জুন এগোল। বাড়িটার সামনে কোনও

ফেন্সিং অথবা গেট নেই। রাস্তা ছেড়ে কিছুটা এগোলেই বারান্দা। ওদের এগোতে দেখে এক ভদ্রমহিলা মাথায় ঘোমটা তুলে দ্রুত ঢুকে গেলেন ঘরে। ওরা বারান্দায় উঠতেই একটি বয়স্ক গলা ভেসে এল, "কাকে চাই ?"

অর্জুন চার পাশে কাউকে দেখতে পেল না। গলার স্বর ভেসে এসেছিল যেদিক থেকে, সেদিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা হরিদাসবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?"

"জলপাইগুড়ির বিমল হোড়মশাই পাঠিয়েছেন।"

"ও, কথা বলছি।"

"আচ্ছা ! আপনিই হরিদাসবাবু ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন আমি পুজো করছি, পরনে গামছা। এই অবস্থায় পুরুষমানুষের সামনে যাওয়া গেলেও কোনও মহিলার সামনে নয়।

www.boiRboi.blogspot.com

"ঠিক আছে। আপনি পুজো শেষ করুন, আমরা অপেক্ষা করছি।"

ইতিমধ্যে একজন মেমসাহেব আগমনের সংবাদ ছড়িয়েছে মহল্লায়। হরিদাস বর্মণের কণ্ঠ চুপ করে গেলেও ইজের-পরা খালি গায়ের শিশু থেকে বয়স্ক মানুষের ভিড় জমতে শুরু করেছে সামনে। ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছ, এরা আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখছে ?"

"সম্ভবত তোমার চামড়া !"

"মাই গড ! চামড়া দেখার কী আছে ?" আঁতকে উঠল ডরোথি।

"ওটা তুমি বুঝবে না। দু'শো বছর ধরে তোমার পূর্বপুরুষ আমাদের মনে যে কমপ্লেক্স ঢুকিয়ে দিয়েছে, এটা তারই ফল।

উপেক্ষা করো, ঠিক হয়ে যাবে ।"

এই সময় ভেতর থেকে একটি মিহি নারীকণ্ঠ ভেসে এল, "আপনারা ঘরে এসে বসুন । বাইরে থাকলে ভিড় বাড়বে ।"

সামনের দরজাটা খুলে গিয়েছিল । ওরা ঘরে ঢুকল । ঘরে কেউ নেই ।

চেয়ারে বসে ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "এরা কেউ সামনে আসছে না কেন ?"

"মনে হয় বাড়িতে হরিদাসবাবু ছাড়া কোনও পুরুষ নেই ।"

"আমি তো মেয়ে, মেয়েরা আসতে পারত !"

অর্জুন উত্তর দিল না । উত্তরবাংলার অনেক পরিবারে এখনও রক্ষণশীলতা ভালভাবে রয়েছে । একজন ইংরেজ মেয়েকে এই ব্যাপারটা বোঝানো যাবে না ।

খড়মের আওয়াজ হল । ভেতরের দরজায় এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ দেখা দিলেন । সাদা ফতুয়ার নিচে লুঙ্গি । মাথার চুল ধবধবে সাদা । অর্জুন উঠে দাঁড়াতেই হরিদাস বর্মণ হাতের ইশারায় বসতে বললেন । তাঁর নজর ডরোথির দিকে গেল, "ইনি কোন দেশের মেয়ে ?"

"ইংল্যান্ড । ওর নাম ডরোথি । আমি অর্জুন ।"

ভদ্রলোক বসলেন । ডরোথির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখানে এখন মেমসাহেব দেখা যায় না বলে বাইরে অত ভিড় হয়েছে । আমি তো ইংরেজি জানি না, কৃষক মানুষ । খেতিখামারির ভাষা বুঝি । বিমলবাবু আপনাদের পাঠিয়েছেন ?"

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ । আপনি তো ময়নাগুড়িতে অনেকদিন আছেন ?"

"হ্যাঁ । প্রথম মহাযুদ্ধের আগে আমার জন্ম ।"

অর্জুন ডরোথিকে বলল, "ইনি ইংরেজি জানেন না । আমি

www.boiRboi.blogspot.com

পরে তোমাকে বুঝিয়ে বলব ।" ডরোথি মাথা নেড়ে সায় দিল ।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আমরা একজন মানুষের কথা জানতে চাই । ওঁর নাম তারিণী সেন । শুনেছি এককালে উনি খুব কুখ্যাত ছিলেন ।"

তারিণী সেনের নাম শুনে সোজা হয়ে বসলেন বৃদ্ধ, "ওর কথা কে বলল ?"

"আমরা খোঁজখবর নিয়েছি ।"

"অদ্ভুত কাণ্ড ! এখন কেউ তারিণীর খবর নেবে ভাবতেই পারি না । হ্যাঁ, কী জানতে চান ওর সম্পর্কে ?"

"উনি এক সময় ডাকাতি করতেন ?"

"হ্যাঁ । সে একটা সময় ছিল যখন তারিণীর ভয়ে মানুষ কাঁপত । ওর একটা টাট্টু ঘোড়া ছিল । সেই ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনলে লোকে ঘরের দরজা বন্ধ করত । তখন এদিকে শুধুই জঙ্গল । এই আমার বাড়ির সামনে বাঘ আসত । অবশ্য বাড়িটা মাটির ছিল । মাটির একতলা । তারিণী সম্পর্কে জানতে চান কেন ? বইটই লিখবেন নাকি ?"

"না । ইনি একটা ডায়েরিতে তারিণী সেনের নাম পড়েছেন । সেই সুবাদেই এখানে এসেছেন আরও খোঁজখবর নিতে । ওর আত্মীয়স্বজন কেউ আছে ?"

"না । নেই । দু-দুটো বিয়ে করেছিল, বাচ্চা হয়নি । এখন বউরাই ওকে খাওয়ায় ।"

"এখন খাওয়ায় মানে ? উনি কি জীবিত আছেন ?"

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, "মাস তিনেক আগেও ওকে দেখেছি ।"

অর্জুনের উত্তেজনা লক্ষ করে ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "কী বললেন উনি ?"

অর্জুন ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "তারিণী সেন বেঁচে আছে ।"

"রিয়েলি ?" চিৎকার করে উঠল ডরোথি।

অর্জুন হকচকিয়ে গেল। ডরোথি যে এত উত্তেজিত হতে পারে, সে ভাবেনি। ডরোথি বলল, "ওঁকে জিজ্ঞেস করো, কোথায় গেলে দেখা পাওয়া যেতে পারে ?"

অর্জুন হরিদাসবাবুর দিকে তাকাল, "উনি কোথায় থাকেন ?"

"তারিণীর বাড়ি হুচ্‌লুডাঙার কাছে। হুচ্‌লুডাঙা চেনেন ?"

"না।"

"এখান থেকে সাত মাইল পূর্বে জলঢাকা নদীর আগে হুচ্‌লুডাঙা। সেখান থেকে তিন মাইল কাঁচা পথ ধরে এগোলে পূর্বদহর মন্দির। সেখানে গিয়ে হাতকাটা তারিণীর খোঁজ নিলে যে-কেউ বলে দেবে।"

হুচ্‌লুডাঙা নামটা অনেকদিন মনে থাকবে। এ-অঞ্চলে অভিনব নামের গ্রাম ছড়িয়ে রয়েছে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তারিণী সেনের যখন বয়স হয়েছে তখন তাঁর স্ত্রীদের তো একই অবস্থা হওয়ার কথা। তাঁরা কী করে রোজগার করেন ?"

www.boiRboi.blogspot.com

"কিছু জমি আছে। সেখানে চাষ হয়। আর বাকিটা ফাইফরমাশ খেটে। কোনও মতে বেঁচে আছে বলতে পারেন। আপনি বললেন, ডায়েরিতে নাম পেয়ে উনি এদেশে এসেছেন। তারিণী কি এই বয়সে কারও সম্পত্তি পাচ্ছে ? এ রকম তো হয় শুনেছি।"

অর্জুন ইচ্ছে করেই রিচার্ডসাহেবের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। বলল, "না, না। আমাদের দেশের একজন কুখ্যাত ডাকাতকে দেখার লোভেই উনি এসেছেন।"

"তা হলে নিয়ে যাবেন না। খুব হতাশ হবেন। ভাল খেতে না পেয়ে তার চেহারা প্রায় হাড় জিরজিরে। ডাকাত বলে মনেই হবে না।" বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করলেন, "আগে প্রায়ই আমার কাছে

আসত টাকা চাইতে। বলতাম এমনি-এমনি দেব না। কাজ করো, টাকা নাও। আমার জোতে সুপুরি, নারকেল গাছ আছে অনেক। দু' হাতে পাঞ্জা কাটা। তবুও সড়সড় করে উঠে যেত নারকেল গাছে। কনুইয়ের ভাঁজে কাটারি গুঁজে ফল কাটত। এ সব অবশ্য অনেক দিন আগের কথা।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওর হাত দুটো কাটা গেল কী করে ?"

"এটা কেউ জানে না। তারিণীও কাউকে বলেনি। নিশ্চয়ই কেউ প্রতিশোধ নিয়েছিল। ও যা করত তাতে তো শত্রুর কোনও অভাব ছিল না।"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। খানিকটা বিরক্ত করে গেলাম। আচ্ছা, নমস্কার।"

বাইরে বেরিয়ে এল এরা। তখনও দর্শকরা অপেক্ষা করছে ডরোথিকে দেখবে বলে। ডরোথি কিছু বলতে যেতেই অর্জুন বাধা দিল, "এখন থেকে বেরিয়ে কোনও ফাঁকা জায়গায় গিয়ে কথা বলব আমরা।"

ময়নাগুড়ি শহর থেকে খানিকটা পূর্ব দিকে যেতেই দু' পাশে ফাঁকা মাঠ। পিচের রাস্তা ছেড়ে বাইক দাঁড় করিয়ে একটু আগে শোনা তথ্যগুলো ডরোথিকে ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিল অর্জুন। সব শুনে ডরোথি নোটবুক বের করে কিছু নোট করে নিয়ে বলল, "আমরা কি এখন ওই হুচ্‌লুডাঙায় যাব ?"

"আমার কোনও আপত্তি নেই। বেশি দূর তো নয়।"

ডরোথি ঘড়ি দেখল, "তোমার খিদে পাচ্ছে না ?"

খাওয়ার ভুলেই গিয়েছিল অর্জুন। এখন মনে হল লাঞ্চের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। ডরোথির জন্য রান্না করে মা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছেন। কিন্তু এখন যদি ওরা জলপাইগুড়িতে লাঞ্চের জন্য ফিরে যায়, তা হলে সব চুকিয়ে আবার এদিকে ফিরে

আসতে-আসতে বিকেল হয়ে যাবে। সে বলল, "কাছাকাছি একটা রোডসাইড ফাস্ট ফুডের দোকান আছে। তোমার একটু অসুবিধে হতে পারে, তবুও সেখানেই ট্রাই করবে নাকি?"

ডরোথি হেসে জবাব দিল, "আই ডোন্ট মাইন্ড।"

ওরা ময়নাগুড়ি বাইপাসে নির্জন মাঠের গায়ে তৈরি নতুন ধাবায় চলে এল। খোলা আকাশের নিচে পাতা খাটিয়ায় বসে শুকনো মুরগির মাংস আর রুটি দিতে বলল অর্জুন। মাংসে যাতে ঝাল না দেওয়া হয় সেটা বারবার মনে করিয়ে দিল।

এরকম দোকানে বসে খাওয়ার অভিজ্ঞতা ডরোথির নেই। তার যে মজা লাগছে বোঝা যাচ্ছিল মুখ দেখে। অর্জুন বলল, "তোমার দাদু কেন যে তারিণী সেনের নাম ডায়েরিতে লিখলেন তা আমি বুঝতে পারছি না। যা জানা যাচ্ছে তাতে লোকটা এত গুরুত্ব পেতে পারে না।"

www.boiRboi.blogspot.com

ডরোথি গম্ভীর গলায় বলল, "আমি শুধু কর্তব্য করছি। তবে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি বলে আমার খারাপ লাগছে।"

"আমারও তো লাভ হচ্ছে। অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম।"

খাওয়া সুবিধে হল না ডরোথির। অর্জুনের ভাল লাগলেও সে মাংস প্রায় ধুয়ে নিয়ে খানিকটা খেল। ধাবাওয়ালার কাছ থেকে আর-একবার হুচলুডাঙায় পৌঁছবার পথ জেনে নিয়ে ওরা বাইকে উঠল।

প্রায় সাত মাইল পথ পেরিয়ে আসার পর ওরা হুচলুডাঙায় পৌঁছলো। একটা ছোটখাটো গ্রাম। কোনও বৈচিত্র্য নেই। পূর্বদহর মন্দিরের কথা জিজ্ঞেস করতেই পথ দেখিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব হল না। শোনা গেল তিন মাইল কাঁচা পথ ধরে যেতে হবে।

রাস্তা ভাল নয়। বাইক লাফাচ্ছিল বেশ। ডরোথি সিট আঁকড়ে বসে ছিল। এই পথে জিপ ছাড়া যাওয়া বেশ কষ্টকর। ামের লোক এখনও গোরুর গাড়ি ব্যবহার করে। মনে হচ্ছিল নন্তকাল ধরে যেতে হবে এবং পৌঁছবার আগে হাড়গোড় ভেঙে বে।

শেষ পর্যন্ত পূর্বদহে পৌঁছনো গেল। মন্দির দেখতে পেল রা। বিশাল ঢিবির ওপরে কাটা পাথরে তৈরি মন্দির। পাশেই কটা দিঘি, যা কাদা এবং পানায় ঢাকা। মন্দির চত্বরে একজন াঢ় দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওদের নামতে দেখে এগিয়ে এসে লেন, "আসুন। ওপাশে যে নদীটা রয়েছে, জল নেই অবশ্য, র নাম চুকচুকা নদী। আর এই দিঘির নাম পদ্মদিঘি। আমি ই মন্দিরে আছি অনেক বছর। আপনাদের সব ঘুরিয়ে দেখাতে ারি।"

অর্জুন বুঝল লোকটি গাইড অথবা পাণ্ডা হতে চাইছে। যদিও ই পাণ্ডববর্জিত মন্দিরে কোনও টুরিস্ট সচরাচর আসে না, তবু োকটাকে নিশ্চয়ই কিছু কথা মুখস্থ করে রাখতে হয়েছে। সে সে বলল, "সঙ্গে মেমসাহেব আছে দেখছেন, ইংরেজি বলতে ারবেন?"

"ইয়েস সার, তবে সেইসঙ্গে নো সার। লিট্‌ল-লিট্‌ল বলতে রি।"

"তা হলে বাংলায় বলুন। এটি কার মন্দির?"

"আজ্ঞে, ইনি জটিলেশ্বর। এই যে গ্রাম পূর্বডহর, এর মানে প্রথম পুজো করা। ডহর মানে পুজো করা। এই মন্দিরের াশে দেখুন একটা লাল রঙের ছোট্ট মন্দির আছে। কোনও এক জা এই মন্দির দুটো তৈরি করেছেন। তবে এখন তো আর সে নেই। সরকার এখান থেকে কুবেরের মূর্তি আর একটা

বিষ্ণুপট্ট নিয়ে গেছে। লোকজন যায় জল্পেশের মন্দিরে। এখানে আসে খুব কম। এদিকে আসুন।"

লোকটি এগিয়ে গেল মন্দিরের কাছাকাছি। "এই দেখুন, মন্দিরের গায়ে নানান ভঙ্গিমায় নারীমূর্তি রয়েছে। ইনি নৃত্যরত গণেশ, উনি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধ। খুব প্রাচীন মন্দির এটি। ওই যে দিঘি দেখছেন, ওখান থেকে মাটি কাটার সময় গারোটি প্রাচীন দেবতার মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। যেমন, শিব, ণেশ, বুদ্ধ, বিষ্ণুচণ্ডী।" লোকটা চোখ বন্ধ করে নমস্কার করল পালে দুটো হাত ঠেকিয়ে, "তাও সরকার নিয়ে গিয়েছেন।"

অর্জুন একটু অবাক হচ্ছিল। হিন্দু মন্দিরের গায়ে বুদ্ধের মূর্তি কন? কোথায় যেন সে পড়েছিল এক কালে এদিকের বৌদ্ধরা ছু হিন্দু দেবদেবীকে নিজেদের ধর্মে গ্রহণ করেছিল। এই গ্রহণ

[redacted]

www.boiRboi.blogspot.com

করা একেবারে স্থানীয়ভাবে। শিব এবং চামুণ্ডাকে বৌদ্ধরা উপাসনা করত বলে নাকি শোনা যায়। কিন্তু এখন মন্দির দেখার বদলে যে-কাজের জন্য তারা এসেছে তাই করা যাক। ডরোথি যেভাবে মন্দির থেকে মুখ ঘুরিয়ে মজা দিঘির দিকে তাকিয়ে আছে তাতে স্পষ্ট যে, তার এসব ভাল লাগছে না।

অর্জুন মন্দির ছাড়িয়ে একটু হাঁটল। লোকটি পেছনে ছুটে এল, "এ কী, পুজো দেবেন না?" মন্দিরের প্রবেশদ্বারে দুই বিশালাকার দ্বারপালের একটি এখনও ভগ্নদশায় দাঁড়িয়ে আছে, অন্যটির দুটো পা নেই। সেদিকে তাকিয়ে অর্জুন বলল, "উনি খ্রিস্টান আর আমি খুব নাস্তিক। আপনি তো এখানে থাকেন, তারিণী সেনকে চেনেন?"

লোকটি হকচকিয়ে গেল, "কোন তারিণী?"

"যার দুটো হাত নেই।"

"ও, হাতকাটা তারিণী! ওকে কে না চেনে!"

"কোথায় থাকেন উনি?"

"ওই যে বাড়িগুলো দেখছেন, ওখানে। কিন্তু আমি যে আপনাদের এত কথা বললাম— ?"

অর্জুন পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে লোকটার হাতে দিল, লোকটা যেন তাতেও খুশি হল না। অর্জুন ডরোথিকে ডাকল। ডরোথি তখন লাল মন্দিরটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। ডাক শুনে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "ও এতক্ষণ তোমাকে কী বলছিল?"

"মন্দিরটার বর্ণনা দিচ্ছিল। তুমি ইন্টারেস্টেড?"

"না। ওকে তারিণী সেনের কথা জিজ্ঞেস করেছ?"

"হ্যাঁ। ওইদিকে। বাইক নিয়ে যাওয়া যাবে না। চলো হাঁটি।"

ওরা হাঁটা শুরু করতে দেখল লোকটা পেছন-পেছন আসছে। ইতিমধ্যে গ্রামের কিছু ছেলে-বুড়ো জড়ো হয়ে গেছে মেমসাহেব দেখতে।

অর্জুন হেসে বলল, "তোমাকে দেখার জন্যে সবারই দেখছি বেশ কৌতূহল।"

ডরোথি বলল, "হ্যাঁ, এখানে এসে নিজেকে বেশ দামি বলে মনে হচ্ছে।"

তারিণী সেনের বাড়িটিকে দেখিয়ে দিল সঙ্গে আসা লোকটি। এক বৃদ্ধা মহিলা দাওয়ায় বসে সুপুরি ছাড়াচ্ছিলেন; ওদের দেখে ময়লা শাড়ির আঁচল মাথায় তুললেন।

লোকটা বলল, "ও জেঠি, এঁরা শহর থেকে এসেছেন। জ্যাঠার খোঁজ করছেন।"

"তার শরীর খারাপ। জ্বর।"

এই সময় ভেতর থেকে আর-একজন বৃদ্ধা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কারা তোমরা?"

দ্বিতীয়জনের চেহারা প্রথমজনের চেয়ে ভাল, বয়স সামান্য কম হতে পারে।

অর্জুন একই কথা বলল। এদিকে পেছনে ভিড় জমছে। মন্দিরে দেখা হওয়া লোকটা এগিয়ে গেল বৃদ্ধার সামনে, "তাড়াতাড়ি ডাকো জ্যাঠাকে। চেয়ে দেখছ না, খোদ মেমসাহেব এসেছেন।"

বৃদ্ধা ভেতরে চলে গেলেন। এবার লোকটি ঘুরে দাঁড়াল, "এই, হট্ হট্। এখানে কী চাই? যেন মেলা বসেছে এমনভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবাই। যা, সরে যা।"

দু-একজন সরল, বাকিরা কয়েক পা পিছিয়ে গেল মাত্র। লোকটি অর্জুনের দিকে তাকাল, "গাঁয়ের মানুষ তো! সব ব্যাপারে

www.boiRboi.blogspot.com

নাক গলানো অভ্যেস।"

অর্জুন জবাব দিল না। সে দেখল দ্বিতীয় বৃদ্ধা দু' হাতে কোনও রকমে ধরে বাইরে নিয়ে আসছেন একজন অসুস্থ মানুষকে। মানুষটির হাত কনুইয়ের ওপরেই শেষ হয়ে গেছে। মুখে সাদা দাড়ি, মাথার চুল অনেকখানি উঠে গেছে। দাওয়ায় বসিয়ে দেওয়ার পর মানুষটি সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করল। কিন্তু তাঁর অসুস্থতা এখন স্পষ্ট।

অর্জুন ডরোথিকে ইংরেজিতে বলল, "ইনিই তারিণী সেন।"

ডরোথি দেখছিল। বলল, "তুমি কি নিশ্চিত? ওর নাম জিজ্ঞেস করেছ?"

অর্জুন কয়েক পা এগিয়ে দাওয়ার ধারে গেল, "আপনার নাম কী?"

বৃদ্ধ মুখ তুললেন, ঘোলাটে চোখ, ঠোঁট চাটলেন, "তিনদিন জ্বর।"

মানুষটি হয়তো কানে কম শোনেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম কী?"

"নাম? অ। তারিণী, লোকে বলে হাতকাটা তারিণী।"

অর্জুন এবার দ্বিতীয় বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেসা করল, "ওঁকে ওষুধ খাওয়াচ্ছেন?"

"ঘরে গুলি-ওষুধ ছিল, তাই খেয়েছে।"

"গুলি-ওষুধ মানে?"

বৃদ্ধা ভেতরে গিয়ে একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশি নিয়ে এলেন। অর্জুন মাথা নেড়ে বলল, "আপনাদের গ্রামে ডাক্তার নেই?"

মন্দির থেকে আসা লোকটি বলল, "থাকবে না কেন, আছে। বাড়িতে এসে দেখলে কুড়ি টাকা নেয়। ওষুধ কিনতে হয়

ধূপগুড়ি, নয় ময়নাগুড়ি যেতে হয়। গরিব মানুষের পক্ষে এসব কি সম্ভব বাবু? আমরা যখন দেখি খুব অবস্থা খারাপ, তখন কোনও মতে হাসপাতালে নিয়ে যাই। এইভাবেই তো সবাই বেঁচে আছি।"

অর্জুন বলল, "আপনি এক্ষুনি গ্রামের ডাক্তারকে ডেকে আনুন তো!"

"আমি?" লোকটা হকচকিয়ে গেল।

"টাকার দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি, আপনি শুধু ডেকে আনুন।"

"অ। তাই বলুন।" লোকটি কয়েক পা হেঁটে একটি তরুণকে নির্দেশ দিতে সে দৌড়লো। অর্জুন এবার বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি কথা বলতে পারবেন?"

"কথা? কী কথা?" বিড়বিড় করলেন বৃদ্ধ।

"পুরনো দিনের, যা আপনার মনে আছে।"

বসে থাকতে নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছিল, তারিণী সেন ধীরে-ধীরে দাওয়ায় শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করলেন। ডরোথি ছুটে এল অর্জুনের পাশে। ভীত স্বরে ইংরেজিতে প্রশ্ন করল, "উনি কি মারা যাচ্ছেন?"

"না, না, মারা যাবেন কেন? অসুস্থ বলে দুর্বল হয়ে পড়েছেন।"

"থ্যাঙ্ক গড, আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম!"

শুয়ে-শুয়েই চোখ খুললেন তারিণী সেন। অর্জুন দেখল ওঁর চোখের মণি ডরোথির দিকে স্থির হয়েছে। সেই অবস্থাতেই গোঙানির গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "এ কে?"

"এর নাম ডরোথি। ইংল্যান্ড থেকে এসেছে আপনাকে দেখতে।"

"কালাপানি!"

www.boiRboi.blogspot.com

"না, না, এখন আর কালাপানি পার হতে হয় না। আকাশ পথে বারো ঘন্টাও লাগে না। এর ঠাকুরদাকে কি আপনি চিনতেন ?"

চোখের পাতা বন্ধ হল। বোঝা গেল আরও কাহিল হয়ে পড়েছেন। এবং তখনই ডাক্তারবাবু এলেন। বছর তিরিশের যুবক। শার্ট প্যান্ট পরা, হাতে ব্যাগ। এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার ?"

অর্জুন বলল, "তারিণীবাবু অসুস্থ, আপনাকে তাই ডেকেছি।"

ডাক্তারবাবু একবার অর্জুন আর একবার ডরোথির দিকে তাকালেন। তাঁর ইতস্তত ভাবটা কেটে গেল। দাওয়ায় উঠে ভদ্রলোক মাটিতেই বসে পড়লেন। পাল্‌স এবং চোখের পাতা টেনে দেখার পর স্টেথো ব্যবহার করলেন।

তারপর মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "ঠান্ডা লাগল কী করে ?"

দ্বিতীয় বৃদ্ধা বললেন, "ঠান্ডার দোষ কী ! রোজ চার বেলা স্নান করে। বললেও শুনতে চায় না। বলে, পাপ ধুয়ে ফেলি।"

www.boiRboi.blogspot.com

ডাক্তারবাবু বললেন, "বুকে সর্দি বসেছে আর তা থেকে জ্বর। বয়স তো অনেক, শরীরে রেজিস্টেন্স পাওয়ার বলে কিছু নেই। তবে ওষুধ পড়লে ভয়ের কিছু নেই।"

"লিখে দিন।" অর্জুন বলল।

ডাক্তার ব্যাগ খুলে কাগজ বের করে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের চিনতে পারলাম না।"

অর্জুন বলল, "আমরা একটু আগে এখানে এসেছি। ইনি ডরোথি, ইংল্যান্ডে থাকেন। আমি অর্জুন, জলপাইগুড়িতে বাড়ি।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনি সেই অর্জুন ?" ডাক্তারের চোখমুখে বিস্ময়।

"সেই অর্জুন মানে ?"

"আপনি তো সত্যসন্ধানী ?"

"ঠিক শব্দটা উচ্চারণ করেছেন।"

"আরে ব্বাস। আপনার দেখা পেলাম এখানে ! কী সৌভাগ্য। আপনার কথা আমি কাগজে পড়েছি। আপনি এখানে কোনও সত্যসন্ধানে নাকি ?"

"তেমন কিছু নয়।"

ডাক্তার প্রেসক্রিপশন না লিখে ব্যাগের ভেতরে হাত দিলেন। দু'রকম ট্যাবলেট আর ক্যাপসুল বের করে বৃদ্ধাকে বললেন, "এখনই এর একটা ওর একটা খাওয়াবেন। বিকেলে আবার একইভাবে খাওয়াতে হবে। বাকি দুটো কাল সকালে। মনে হয় তার মধ্যে জ্বর কমে যাবে। কাল সকালে আর এক বার দেখার পর ওষুধের কথা বলব। আমার কাছে না থাকলে ময়নাগুড়ি থেকে আনাতে হবে। এখন একটা কিছু খাইয়ে তবে ওষুধ খাওয়ান।"

"কিছুই খেতে চায় না।"

"চায় না বললে তো হবে না। জোর করে খাওয়ান।" ডাক্তার বৃদ্ধার হাতে ওষুধ দিয়ে দাওয়া থেকে নামতেই অর্জুন পার্স বের করল।

ডাক্তার হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "না, না। আমাকে টাকা দিতে হবে না।"

"সে কী, আপনি এলেন, ওষুধ পর্যন্ত দিয়ে দিলেন।"

মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, "হ্যাঁ, আমি বাড়িতে এসে রুগী দেখতে কুড়ি টাকা নিই। কারণ আমাকেও সংসার চালাতে হয়। এদিকের অধিকাংশ বাড়িতে গিয়ে রুগী দেখার পর শুনতে হয় পরে টাকা দেব। যা কখনও পাওয়া যায় না। সঙ্গে ওষুধ না

থাকলে তো ওঁকে দিতে পারতাম না। কিন্তু আপনার কাছে আমি টাকা নিতে পারব না। আপনার সঙ্গে আলাপ হল এটাই আমার বড় পাওয়া।"

"কিন্তু আপনার তো ক্ষতি হয়ে গেল!"

"পকেট থেকে তো কিছু গেল না। ওষুধগুলো সেলস্‌ম্যানদের দেওয়া। ছাড়ুন তো এসব কথা। কোন রহস্য সন্ধানে এসেছেন শুনতে পারি কি?"

"কোনও রহস্য নেই। ওঁর কথা উনি ইংল্যান্ডে বসে শুনেছিলেন, তাই দেখতে এসেছেন।"

মন্দিরের লোকটি বলল, "তারিণী জ্যেঠার নাম সাহেবদের দেশে শোনা যায়?"

অর্জুন নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

"কপাল বটে। এলেন বলে পেটে ওষুধ যাচ্ছে। জেঠি, ওষুধ খাওয়াও।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওঁর সঙ্গে কালকের আগে ভাল করে কথা বলা যাবে না, না?"

"না। অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা তো লাগবেই।" ডাক্তার বললেন।

অর্জুন ডরোথিকে ব্যাপারটা জানাল। ওদিকে তখন বৃদ্ধা মুড়ি খাওয়াবার চেষ্টা করছেন তারিণী সেনকে। ডরোথি বলল, "তুমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করো, ওঁর মরে যাওয়ার কোন আশঙ্কা নেই তো?"

ডাক্তারবাবু সেটা শুনতে পেয়ে ইংরেজিতে বললেন, "যা বয়স হয়েছে তাতে কেউ কোনও প্রেডিক্ট করতে পারে না। তবে এই জ্বরের জন্যে যে মারা যাবেন না, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। চলুন, আমার ওখানে গিয়ে একটু চা খাবেন।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "আজ নয়। আমাদের তো আবার

আসতেই হবে। তখন নিশ্চয়ই আপনার কাছে যাব। ধরুন, কাল বিকেলে—। আপনি কিন্তু কাল সকালে এসে একবার ওঁকে দেখে যাবেন।"

বিকেল হয়ে এসেছিল। বাইকে চেপে তিস্তা ব্রিজ পার হওয়ার সময় ডরোথি বলল, "আমরা খুব লাকি। মাসখানেক পরে এলে হয়তো লোকটা মরে গেছে বলে শুনতাম। এত গরিব মানুষ আমি ভাবতে পারিনি! এত গরিব তবু দু-দুটো বিয়ে করেছে। অদ্ভুত!" অর্জুন হাসল। ডরোথিকে বোঝানো যাবে না এক সময় গ্রাম বাংলায় কী রকম কুসংস্কার চেপে বসেছিল। তার কানে এল ডরোথি নিজের মনে বলছে, "কিন্তু লোকটার অবস্থা এ রকম হওয়ার কথা নয়।"

অর্জুনও তাই মনে করল। যে সারা জীবন ডাকাতি করে রোজগার করেছে প্রচুর, তার অবস্থা এমন হবে কেন? হঠাৎ খেয়াল হল। কথাটা ডরোথি জানল কী করে? রিচার্ড সাহেব কি

www.boiRboi.blogspot.com

তাঁর ডায়েরিতে তারিণী সেনের ডাকাতি করার কথা লিখেছেন? লিখলে সেই কথা ডরোথি তাকে বলেনি কেন? উলটে কমলাকান্ত রায়দের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে একইভাবে তারিণী সেনের নাম উচ্চারণ করেছে। এটা কী রকম হল?

রাত্রে ডরোথিকে খাবার পৌঁছে দিয়ে অর্জুন পোস্ট অফিসের মোড়ে এসে দাঁড়াল। জলপাইগুড়ি শহরে রাত আটটার পর রাস্তায় মানুষ কমে যায়। কিন্তু এই মোড়ে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব

করার অভ্যেস অনেকের আছে। অর্জুন পরিচিত মুখ খুঁজল, পেল না। ঠিক তখনই সে গাড়িটাকে দেখতে পেল। সাধারণ গতিতেই রেসকোর্সের দিকে যাচ্ছে। সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে একটা লোক বসে আছে। এই গাড়িটাকে সে গতকাল দেখেছে বেশ বেপরোয়া গতিতে চালাতে। গত রাতের অপরাধের জন্যে এখন গিয়ে কিছু বলা যায় না।

মোড়ের দোকান থেকে সে এক গ্লাস চা নিল। ডরোথি আসার পর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য জানা ছাড়া কোনও উত্তেজক ঘটনা ঘটেনি। বরং বলা যেতে পারে বেশ একঘেঁয়ে লাগছে। ডরোথি যাদের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে তাদের আত্মীয়রা ওকে গালাগাল দিতে পারত, এই নিয়ে শহরে টেনশন বাড়তে পারত, কিন্তু কিছুই হয়নি। অনেকখানি সময় চলে গেলে মানুষ আর উত্তেজিত হয় না। মিরজাফর বিশ্বাসঘাতক ছিলেন কিনা তা নিয়ে এখন মানুষ মাথা ঘামায় না। যারা ঘামাতে চায়, তাদের সংখ্যা খুব কম।

কমলাকান্ত রায় অথবা দেবদাস মিত্রের পর্ব চুকে গেছে। শেষতম ব্যক্তি তারিণী সেনকে আজ পাওয়া গেল। আগামীকাল বিকেলে ওর সঙ্গে কথা বলে ডরোথি ফিরে যাবে। ফেরার টিকিট তাহলে কাল সকালে করে ফেলা উচিত। সে তারিণী সেনের ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবল। তারিণী ছিল কুখ্যাত ডাকাত। টাট্টুতে চেপে ডাকাতি করত। ওর ভয়ে সবাই কাঁপত। শেষ পর্যন্ত তারিণী এক সময় ধরা পড়ল। কিন্তু সাক্ষীর অভাবে বিচার হল না, ছাড়া পেয়ে গেল। শহর থেকে ফিরে গিয়ে তারিণী ডাকাতি ছেড়ে দিয়েছিল। এই সময় সে বিপ্লবীদের কথা ইংরেজদের কাছে পৌঁছে দিত। কোন ইংরেজের কাছে? ডায়েরি যদি সত্যি হয় তা হলে রিচার্ড অথবা ম্যাক সাহেবের সঙ্গেই

তারিণীর যোগাযোগ ছিল। সেই জন্য লোকটার হাত বিপ্লবীরা কেটে নিতে পারে। প্রশ্ন হল, যারা হাত কেটেছিল তাদের নাম কি তারিণী ম্যাকসাহেবকে বলেছিল? বললে তিনি যদি কোনও অ্যাকশন নিতেন তা হলে সেটা বিমল হোড় মশাই অথবা সুধীরবাবু নিশ্চয়ই বলতেন। ম্যাক সাহেব নিশ্চয়ই কোন অ্যাকশন নেননি। দেশে ফিরে গিয়ে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর এই কারণে অনুশোচনা হতেই পারে, যা ডায়েরিতে লিখে গেছেন তিনি। কিন্তু খটকা লাগছে অন্য জায়গায়। তারিণী সেন জলপাইগুড়িতে এসে ম্যাক সাহেবের সঙ্গে দেখা করত কিনা তা জানা যায়নি। কিন্তু ম্যাকসাহেব প্রায়ই নদী পেরিয়ে ওদিকে যেতেন। কমলাকান্ত রায় অথবা দেবদাস মিত্রকে আহত অবস্থায় নদীর ওপারেই পাওয়া গিয়েছে। নিশ্চয়ই তখন তাঁর সঙ্গে তারিণীর দেখা হত। কী কথা হত? তারিণী যে ডাকাতি করত, তা রবিনহুডের মতো খরচ করে উড়িয়ে দেয়নি। সেই সব সম্পদ কোথায় গেল? অর্জুনের মনে হল তারিণী সেনের সঙ্গে কথা বললে অনেক গোপন তথ্য জানা যাবে। যেটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। অবশ্য মনে হওয়ার পেছনে ছুটে কোনও লাভ নেই।

www.boiRboi.blogspot.com

চায়ের দাম মিটিয়ে বাইকে উঠতেই অর্জুন গাড়িটাকে দেখতে পেল। কালো রঙের অ্যাম্বাসাডারটা। গাড়িটা মোড় ঘুরে হাকিমপাড়ার দিকে চলল। গাড়িটা ফাঁকা রাস্তায় বেশ জোরেই যাচ্ছিল। অর্জুনের মনে হল ড্রাইভার ছাড়া আরও দু'জন আরোহী রয়েছে গাড়িতে। অথচ একটু আগে একজন কম ছিল। তৃতীয়জন বসে আছে পেছনের আসনে। এই গাড়ির যাত্রীদের কেউ তিস্তা ভবনে থাকে। এত রাত্রে ওরা কোথায় যাচ্ছে? ওদের সম্পর্কে একটু খোঁজ নেওয়া দরকার। ডরোথি তিস্তা ভবনে একা রয়েছে। ওর কোনও বিপদ হলে সে দায়ী হবে।

অমলদা তাকে চিঠি লিখেছেন ডরোথির দায়িত্ব দিয়ে। সে মিনিট দেড়েকের মধ্যে তিস্তা ভবনে পৌঁছে গেল। গেট খোলা। ভেতরে ঢুকে বাইক বন্ধ করে নেমে দাঁড়াল সে। চৌকিদারটা কোথায়? সে ওপরে উঠল। দোতলায় আলো জ্বলছে। ডরোথির ঘরের সামনে পৌঁছে সে হকচকিয়ে গেল। দরজায় তালা দেওয়া।

সে এপাশ-ওপাশে তাকাল। দরজায় তালা দিয়ে কাছাকাছি গেলে ওঠার সময় দেখা যেত। এত রাত্রে কোথায় গেল মেয়েটা! হঠাৎ কালো গাড়ির তৃতীয় আরোহীর ঝাপসা মূর্তি স্মরণে এল। ডরোথি কি? ওই কালো গাড়িতে সে কেন যাবে? এমন হতে পারে, যারা এখানে আছে তাদের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে এবং অনুরোধ ফেরাতে না পেয়ে এখন বেড়াতে বেরিয়েছে। অজানা জায়গায় ডরোথি নিজের ওপর যতই আস্থা রাখুক এভাবে যাওয়া যে ঠিক নয়, এটা তার বোঝা উচিত।

www.boiRboi.blogspot.com

অর্জুন নিচে নেমে চৌকিদারকে দেখতে পেল। লোকটা বালিশ বগলে নিয়ে আসছে। এই তিস্তা ভবনের একজন কেয়ারটেকার আছেন। কাল ওঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে। যে-কোনও মানুষ যদি একটুও বাধা না পেয়ে ওপরে উঠে যায়, তা হলে তো মুশকিল!

অর্জুন চৌকিদারকে বলল, "মেমসাহেবকে দেখেছ?"

"হ্যাঁ। একটু আগে গাড়িতে করে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গের বাঙালিবাবু বললেন যে ফিরতে একটু রাত হবে।"

"সঙ্গে যারা গেল তারা কি এখানেই উঠেছে?"

"না, বাবু। কাল বিকেলে ওরা এসেছিলেন। রাত্রেও একবার। আবার আজ আপনি খাবার দিয়ে চলে যাওয়ার পর গাড়ি নিয়ে আসেন।"

"কোথায় গেল ওরা, কিছু শুনলে?"

"ইংরেজিতে কথা বলছিল, তাই বুঝতে পারিনি।"

অর্জুনের চোয়াল শক্ত হল। এই লোক দুটো কে? সুধীর মৈত্রের বাড়িতে রাতদুপুরে যারা হামলা করেছিল তারাই মনে হচ্ছে। ডরোথির সঙ্গে এদের কী করে যোগাযোগ হল? ডরোথিকে সে সরাসরি এয়ারপোর্ট থেকে তুলে নিয়ে জলপাইগুড়িতে এসেছে। সেখানে কারও সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেখেনি সে। তা হলে গতকাল থেকে লোক দুটো এখানে এসে যোগাযোগ করছে কী করে?

অর্জুন বাইকে উঠল। ডরোথিকে সুধীর মৈত্রের নাম-ঠিকানা বলে আসার পরই গত রাত্রে লোক দুটো পাহাড়ি পাড়ায় পৌঁছেছিল। অর্থাৎ ডরোথিই ওদের সন্ধান দিয়েছে। নিজেকে কী রকম প্রতারিত বলে মনে হচ্ছে এখানে। মনে হচ্ছে কলকাতা থেকেই ডরোথির সঙ্গে ওদের যোগাযোগ। ডরোথি যে তিনজনের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে— ! সত্যি কি ক্ষমা চাইতে এসেছে? তা হলে পেছনে দু'জন গোপন সঙ্গী নিয়ে আসবে কেন? তাকে দিয়ে মানুষজনের সন্ধান করিয়ে ও কোন কাজ হাসিল করতে চায়? মেয়েটার মুখ মনে পড়ল। একবারের জন্য মনে হয়নি ওর গোপন কোনও মতলব আছে। তা ছাড়া ওকে পাঠিয়েছেন অমলদা। ওর সম্পর্কে কিছু না জেনে অমলদা কি অর্জুনের কাছে পাঠাবেন? তার এখন কী করা উচিত?

বাইকে চেপে শহরে চলে এল সে। দরজায় তালা দেওয়া রয়েছে। ঘরে ঢুকে যদি ডরোথির জিনিসপত্র, বিশেষ করে ওই নোটবুক দেখা যেত, তা হলে কিছুটা সুবিধে হত। হঠাৎ ওর মনে হল ওরা তারিণী সেনের কাছে যাচ্ছে না তো? এত রাত্রে গ্রামে গাড়ি ঢুকলে মানুষ অন্য রকম আচরণ করতে পারে। ডাক্তার

বলেছেন আজ তারিণী সেনের সঙ্গে কথা বলা যাবে না। ডরোথি কী কথাটাকে বিশ্বাস করেনি? ওরা কি এমন কথা আলাদা করে বলতে চায়, যা কাল অর্জুনের সঙ্গে গিয়ে ডরোথি বলতে পারত না? অর্জুনের মনে হল তারিণী সেনের বিপদও হতে পারে। শুধু ক্ষমা চাইতে এত রাত্রে এভাবে গোপনে কেউ অত দূরে যেতে পারে না। তারিণীকে বাঁচানো দরকার।

অর্জুন ঘড়ি দেখল। ওরা এতক্ষণে দোমহনি ছাড়িয়ে গেছে। বাইক চালিয়ে ওদের ধরা যাবে না। সে দ্রুত জলপাইগুড়ি থানায় চলে এল। থানার ও সি অবনীবাবু নিজের টেবিলে বসে কাজ করছিলেন এত রাত্রেও। অর্জুনকে দেখে বললেন, "আবার কিসে জড়ালেন?"

অর্জুন বলল, "একটা উপকার করতে হবে। ময়নাগুড়ি থানায় ফোন করে বলুন একটা কালো অ্যাম্বাসাডার হুচলুডাঙা হয়ে পূর্বদহে যাচ্ছে। যে করেই হোক ওদের আটকাতে হবে। প্লিজ।"

অবনীবাবু অবাক হলেন, "ওদের অপরাধ?"

"আপনাকে সব বলব। শুনতে গেলে যে-সময় লাগবে, তা আমাদের হাতে নেই।"

"কিন্তু আটকাতে গেলে তো কারণ দেখাতে হবে।"

অর্জুন অসহায় চোখে তাকাল। তারপর বলল, "ধরুন, পূর্বদহের কোনও মন্দির থেকে প্রাচীন মূর্তি চুরি গেছে। তাই রাত্রে কাউকে ওদিকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।"

"সত্যি চুরি গেছে নাকি?"

"না। তবে তার চেয়ে ভয়ানক কিছু হতে পারে।"

অবনীবাবু টেলিফোনের রিসিভার তুললেন, "দেখবেন মশাই, যেন বিপদে না পড়ি। তবে আপনার ওপর আমার আস্থা

আছে।"

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ময়নাগুড়ির লাইন পাওয়া গেল। অবনীবাবু অর্জুনের অনুরোধ জানালেন। ওপার থেকে পুলিশ অফিসার জানতে চাইলেন গাড়িটাকে আটক করা হবে কি না! অর্জুন মাথা নাড়তে অবনী সেইরকম জানিয়ে দিলেন।

অবনীবাবু সোজা হয়ে বসে বললেন, "খবর কী? ক'দিন থেকে একটি বিদেশিনী মহিলাকে নিয়ে ঘুরছেন বলে শুনতে পেলাম।"

"ভুল শোনেননি। তাকে নিয়েই এই বিভ্রাট।"

অর্জুন ধীরে, ধীরে সব ঘটনা অবনীবাবুকে খুলে বলল। অবনীবাবু মন দিয়ে শুনে বললেন, "না, মশাই। একটি ব্রিটিশ মেয়ে তার পূর্বপুরুষের করা অন্যায়ের জন্যে ক্ষমা চাইতে এতদূরে একা চলে আসবে, এ-কথা বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।"

"ঠিকই। কিন্তু কিছু বিদেশিনী মহিলা তো একসময় আমাদেরই মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। এই যেমন এখন মাদার টেরেসা। তাঁকে তো আমরা মা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি।"

www.boiRboi.blogspot.com

অবনীবাবু মাথা নাড়লেন, "উনি মহামানবী। যেমন সিস্টার নিবেদিতা। কিন্তু সাধারণ বিদেশিনীদের সম্পর্কে অতটা ভাবার কোনও দরকার নেই, যতক্ষণ না প্রমাণ পাচ্ছেন। যাকগে, আপনার কি মনে হয় উনি তারিণী সেনের জন্যেই এসেছেন?'

"এখন তাই মনে হচ্ছে। কমলাকান্ত রায় অথবা দেবদাস মিত্র ওঁর লক্ষ্য নয়। ওঁদের নাম উনি হয়তো দাদুর ডায়েরিতে পেয়েছিলেন, ওই পর্যন্ত।"

"তা হলে তারিণী সেনের ওপর সিনেমা করতে কেউ আসেনি?"

"আমি বিশ্বাস করছি না।"

"ওই লোক দুটোর সঙ্গে ডরোথির যোগাযোগ হল কী করে?"

"তা জানি না।"

"ডরোথির পাসপোর্ট আপনি দেখেছেন?"

"না। দেখার কথাও নয়।"

"তা হলে ওই দুজনের সঙ্গে এত রাত্রে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া এবং তা আপনাকে না বলে—শুধু এ-কারণেই আপনার সন্দেহ হচ্ছে?"

"না। ওরা গতকালও ডরোথির সঙ্গে দু'বার যোগাযোগ করেছিল, কিন্তু সে এ-কথা আমাকে জানায়নি। ডরোথির কাছ থেকে খবর পেয়েই ওরা সুধীরবাবুর বাড়িতে গিয়েছিল। অত রাত্রে যারা সুধীরবাবুর বাড়িতে যেতে পারে, তারা তারিণী সেনকে তুলে নিয়ে আসতে দ্বিধা করবে না, যদি তেমন প্রয়োজন থাকে।"

www.boiRboi.blogspot.com

এই সময় টেলিফোন বাজল। অবনীবাবু রিসিভার তুলে কথা শুনতে-শুনতে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, "ওদের কোনও অজুহাত দেখিয়ে আধ ঘণ্টা আটকে রেখে তবে ছাড়ুন। দেখবেন যেন কোনও মতে সন্দেহ না করে।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, "ময়নাগুড়ি থানা থেকে একটা পেট্রোল ভ্যানকে ওয়ারলেসে খবর দিয়েছিল। ওরা গাড়িটাকে আটকেছে। হাইওয়েতে জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকার পুলিশের আছে। ওরা তিনজনেই ওখানে আধ ঘণ্টার মতো থাকবে। তারপর ফিরে আসতেও মিনিট কুড়ি। তার মানে আমাদের হাতে পঞ্চাশ মিনিট। চলুন, একবার ডরোথির ঘরটা দেখে আসি। চটপট।" অবনীবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

"কিন্তু ওর ঘরে তালা মারা।" অর্জুন বলল, "ল্যাংড়া পাঁচুকে

পেলে হত !"

অবনীবাবু বললেন, "একটা চান্স নেওয়া যেতে পারে। হাসপাতালের উলটো দিকের গলিতে ও নেশা করতে আসে। অবশ্য এখন যা রাত হয়েছে তাতে না পাওয়ারই সম্ভাবনা। চলুন, পথেই তো পড়বে।"

ল্যাংড়া পাঁচু অর্জুনের কাছে কৃতজ্ঞ। তাকে জেল থেকে বাঁচিয়েছে সে। আগে তালা খোলার নৈপুণ্যের কারণে ডাকাতদের সঙ্গী ছিল। এখন লটারির টিকিট বিক্রি করে। অবনীবাবুর জিপে হাসপাতালের সামনের গলিতে যাওয়ামাত্র কিছু লোক এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। আধো অন্ধকারেও পুলিশের জিপ ঠিক চিনে ফেলেছিল তারা। কিন্তু একটি গলা চিৎকার করে উঠল, "পালাচ্ছিস কেন ? এই হতভাগারা ? আমি চোর-ডাকাত নই যে পালাব। হুম।"

অর্জুন দেখল ল্যাংড়া পাঁচু বাবু হয়ে বসে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল, "তোমার অবস্থা কীরকম ?"

চোখ বড় করে দেখার চেষ্টা করল ল্যাংড়া পাঁচু। চিনতে একটু কষ্ট হল। তারপর চিনে ফেলতেই মাথা নাড়ল, "এখনও দশটা বাজেনি।"

"এখন এগারোটা বেজে গেছে।"

"অসম্ভব ! দশটার মধ্যে আমি ঘরে ফিরে যাই। আমি যখন যাইনি, তখন এগারোটা বাজবে কী করে ?"

"উঠতে পারবে ?" অর্জুন ধমক দিল।

"আপনি আদেশ করলে আমি উড়তেও পারব।"

ল্যাংড়া পাঁচুকে ধরে-ধরে নিয়ে এল অর্জুন জিপের কাছে। অবনীবাবুকে দেখে ল্যাংড়া পাঁচু বলল, "আই বাপ, শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাবেন নাকি ?"

তাকে গাড়িতে তুলে অর্জুন বলল, "তোমার মাথা কেমন আছে এখন ?"

"আপনাদের চিনতে পারছি।"

"তা হলেই হবে। একটা তালা খুলবে তুমি।"

"না। অসম্ভব ! আপনার নির্দেশে ও-কাজ ছেড়ে দিয়েছি আমি।"

"মানুষের উপকার হলে কেন করবে না ?"

"কেউ আমার উপকার করে না। আমি কেন করব ?"

অর্জুন কিছু বলার আগে গাড়ি চালাতে-চালাতে অবনীবাবু বললেন, "কেন, অর্জুনবাবু তোমার উপকার করেননি ?"

"একশোবার। সবাইকে বলি সে-কথা।" ল্যাংড়া পাঁচু মাথা নাড়ল, "কিন্তু সঙ্গে যন্ত্রপাতি নেই। সব ফেলে দিয়েছি তিস্তার জলে।"

অর্জুন বলল, "দ্যাখো পাঁচু, একটি মানুষের জীবন বিপন্ন। তাকে রক্ষা করতে চাই আমরা। এই তালা সেই কারণে খোলা দরকার।"

"অ। এটা প্রথমে বললেই পারতেন। মোটা তার চাই।"

অবনীবাবু গাড়ির ড্রয়ার খুলে তার বের করে দিলেন। ল্যাংড়া পাঁচু সেটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কিছু একটা বানাতে লাগল।

পুলিশের গাড়ি দেখে চৌকিদার ছুটে এল। অবনীবাবু চাপা গলায় বললেন, "আপনি ওকে নিয়ে এগিয়ে যান, আমি ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটাই। আপনার মেমসাহেব যদি ফিরে আসে, তা হলে হর্ন বাজাব।" অর্জুন ঘাড় নেড়ে ল্যাংড়া পাঁচুকে ইশারা করল।

অবনীবাবু কেয়ারটেকারের সঙ্গে সাবলীল ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগলেন। অর্জুনরা যে গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢুকছে তা

www.boiRboi.blogspot.com

দেখেও দেখল না চৌকিদার। অবশ্য অর্জুনের জন্য ওর কোনও চিন্তা ছিল না। সিঁড়ি ভেঙে ল্যাংড়া পাঁচু দ্রুত ওপরে উঠে এল অর্জুনের পেছন-পেছন। নির্জন দোতলায় আলো জ্বলছে, দরজায় তালা, যেমনটি অর্জুন দেখে গিয়েছিল।

ল্যাংড়া পাঁচু তালার গায়ে হাত বোলালো, "এ যে দেখছি বিলিতি জিনিস।"

"হতে পারে। চটপট খোল।"

"এরকম তালা অনেকদিন আগে একবার খুলেছিলাম। বার্মিংহাম না কী যেন একটা জায়গায় তৈরি হয়। বেশ খানদানি তালা।"

"আঃ। কথা বোলো না।" অর্জুন বিরক্ত হল।

"আপনি বুঝতে পারছেন না। এমন জিনিস তো চট করে দেখতে পাওয়া যায় না। আহা। কী ফিনিশ! চাবি ছাড়া যে কেউ এটা খুলে দেখাক। তার পায়ের ধুলো মাথায় নেব আমি। www.boiRboi.blogspot.com একেবারে রানি তালা।" চোখ বন্ধ করে বলে যাচ্ছিল ল্যাংড়া পাঁচু, তালার গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে। তারপরই সোজা হল, "মনে হচ্ছে পেয়েছি। তা তালা খুলে আবার লাগাতে হবে, না এটাকে নিয়ে যাব?"

"আবার লাগাতে হবে।"

"অ।" কথাটা মনঃপূত হল না লোকটার। অর্জুন দেখছিল যেভাবে ডাক্তাররা অপারেশন করে, সেইভাবে কাজ শুরু করে দিয়েছে ল্যাংড়া পাঁচু, এরই মধ্যে। মিনিটদুয়েক চুপচাপ কেটে গেল। অর্জুন অস্থির হয়ে উঠছিল। ঠিক তখনই হাসির শব্দ কানে এল। তালা হাতে নিয়ে ল্যাংড়া পাঁচু হাসছে। "আবার হার মানলি। আমার নাম পাঁচুগোপাল রে!"

অর্জুন চট করে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। ঘরের এক কোণে

সুটকেসটা রয়েছে। টেবিলের ওপর হাতব্যাগ। চটপট সেটা খুলল। পাসপোর্ট রয়েছে ওপরে। সেটার পাতায় নজর বোলাতে লাগল। ডরোথি ভারতে এসেছে সাতদিন আগে। প্রথমে দিল্লিতেই নেমেছে সে। দিল্লি থেকে কলকাতায় নিশ্চয়ই ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে পৌঁছেছে, তাই পাসপোর্টে তার কোনও এন্ট্রি নেই। বাগডোগরায় পৌঁছবার আগে ও দিল্লি এবং কলকাতায় পাঁচদিন কী করছিল তা জানা যাচ্ছে না। পাসপোর্ট বলছে ডরোথি মাস ছয়েক আগে আর-একবার দিল্লিতে এসেছিল। দু'দিন ছিল মাত্র। এ-কথা ডরোথি একবারও বলেনি।

ব্যাগে শ' তিনেক পাউন্ড ছাড়া প্লেনের টিকিট দেখতে পেল। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের। এ ছাড়া একটা চাবি এবং প্রসাধনী সামগ্রী। নোট বইটাকে দেখতে পেল না সে। এবার সুটকেসটা। ব্যাগটাকে ভাল করে যথাস্থানে রেখে সে সুটকেসের সামনে গেল। তালাবন্ধ। নম্বর ঘুরিয়ে লক করে দেওয়া হয়েছে। হয়তো চেষ্টা করলে ল্যাংড়া পাঁচু এটাকে খুলতে পারবে, কিন্তু তার জন্য আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। অর্জুন ওয়াড্রোব খুলে দেখল সেখানে কিছু ব্যবহৃত পোশাক ঝুলছে। পোশাকগুলো হাতড়ে দেখল পকেটে কিছু নেই। বিছানার দিকে তাকাল। একেবারে নিপাট বিছানা নয়। বালিশের পাশে একটা বই। থ্রিলার। অর্জুন থ্রিলারটা তুলে নিল। ওপরে রিভলভারের ছবি। পাতা উলটে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। সেটাকে রেখে বালিশটা তুলতেই নোটবুকটা চোখে পড়ল। চটপট পাতা ওলটাল। প্রথম দিকে কিছু কোটেশন লিখে রাখা হয়েছে। মানুষের জীবন নিয়ে সাহিত্যিকদের রচনা থেকে নির্বাচিত লাইন। তার পরের পাতায় কিছু ইংরেজি নাম, নামের পাশে ওয়ান, টু

লেখা। হঠাৎ এক পাতায় লেখা বিল মেট রে ইন ডেল্হি। পাতাগুলোর খানিকটা সাদা। হঠাৎ লেখা কমলাকান্ত রে, দেবদাস মিটার অ্যান্ড তারিণী সেন। তারিণী সেনের নামটার চারপাশে লাইন টেনে ঘর করা হয়েছে। কমলাকান্তর নামের পাশ থেকে একটা লাইন বেঁকিয়ে নিচে নামিয়ে সেই বক্সের গায়ে শেষ করেছে ডরোথি। নোটবুকে আর কোনও লেখা নেই। ওটাকে বালিশের নিচে নামিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল অর্জুন।

ল্যাংড়া পাঁচু তখনও তালাটাকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে যাচ্ছে। অর্জুন তাকে বলল, "এবার ওটা লাগিয়ে দাও!"

হাসল ল্যাংড়া পাঁচু, "আমি বোধ হয় অভিমন্যু হয়ে গেলাম। ওর চুপসে যাওয়া মুখের হাসিটাকে ঠিক শকুনির হাসি মনে হল "কী আজেবাজে বকছ?"

"সত্যি বাবু! এ খানদানি জিনিস। গুরুবলে খুলে ফেলেছি। কিন্তু বন্ধ করতে গিয়ে বুঝতে পারছি এ কী জিনিস!"

"দ্যাখো, আমার হাতে সময় নেই। যেমন করে পারো বন্ধ করো।" অর্জুনের গলায় এবার বেশ উত্তেজনা। ডরোথি যেন না বুঝতে পারে ঘরে কেউ ঢুকেছিল।

দরজার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল ল্যাংড়া পাঁচু। তালাটাকে কড়ায় ঝুলিয়ে জিভে শব্দ করল, যেন কোনও পোষা প্রাণীকে আদর করছে। অর্জুন গাড়ির হর্ন শোনার জন্য কান খাড়া করল। যে-কোনও মুহূর্তে ডরোথিরা ফিরে আসতে পারে। ওদের মুখোমুখি এখনই হতে চায় না সে।

ল্যাংড়া পাঁচু যতবারই তালা বন্ধ করে টেনে দেখছে, ততবারই ওটা খুলে যাচ্ছে। তার মুখ থেকে ছোটখাটো গালাগালি বেরিয়ে আসছিল। অন্য সময় হলে অর্জুন আপত্তি করত, কিন্তু এখন করল না। সে বলল, "তোমার এত নাম, আর তুমি হার

মানবে?"

"হার মানলে আপনার জন্যে মানব।"

"তার মানে?"

"আপনি সেই যে আমাকে থানা থেকে বের করে এনে বললেন লাইন ছেড়ে দিতে, তারপর তো আর চর্চা নেই। খুলবে কেন?" ল্যাংড়া পাঁচু তখনও তালা ঘোরাচ্ছে।

অর্জুন ঢোঁক গিলল। হঠাৎ ল্যাংড়া পাঁচু তারটাকে পকেটে পুরে ওপর থেকে তালার মাথায় আঘাত করতে ওটা ভেতরে ঢুকে আটকে গেল। ওর মুখ থেকে অদ্ভুত একটা আওয়াজ ছিটকে উঠল, "যাঃ বাবা। চাপ দিলেই তো বন্ধ হত। আমি এতক্ষণ ওর পেটের ভেতরে তার ঘোরাচ্ছিলাম। সহজ জিনিসটা কখনওই মাথায় আসে না।"

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে তালাটাকে টেনে দেখল ওটা আটকে গেছে। সে চাপা গলায় ল্যাংড়া পাঁচুকে বলল, "চটপট নেমে এসো।"

www.boiRboi.blogspot.com

নেমে আসার পথে ল্যাংড়া পাঁচু বকর-বকর করছিল, এর আগে সে কত রকমের জটিল তালা খুলেছে, অথচ কোনওটাই বন্ধ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। আজ বুঝতে পারছে যে, কোনও জিনিস খোলা অথবা ভাঙা সহজ, কিন্তু বন্ধ করা অথবা গড়া খুব কঠিন।

নিচে নেমে অর্জুন বলল, "এবার সোজা বাড়ি ফিরে যাও।"

"অ্যাত্ত দূর থেকে হেঁটে বাড়ি যাব?"

"রিকশায় যাও।" পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে সে লোকটাকে দিল।

মাথা নাড়ল লোকটা, "এত রাতে রিকশা পাব না।"

অগত্যা ওকে জিপের পেছনে বসাতে হল। অবনীবাবু তখনও চৌকিদারটার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিলেন। এবার জিপ ঘুরিয়ে

তিস্তা ভবনে পৌঁছবার বিপরীত দিকে খানিকটা গিয়ে একটা অন্ধকার জায়গায় ওটাকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেন, "কিছু পেলেন ?"

"তেমন কিছু নয়। তবে দুটো তথ্য পাওয়া গিয়েছে। ডরোথি যে মিথ্যেবাদী, তা স্পষ্ট।"

"যেমন ?"

"ওর পাসপোর্ট বলছে, এর আগে মাস ছয়েক আগেই ডরোথি দিল্লিতে এসেছিল। আর এবার এসেছে দিন সাতেক আগে। এসে ও পাঁচ দিন কোথাও ছিল। এসব কথা আমাকে বলেনি ডরোথি।" অর্জুন জানাল।

"দিন সাতেক আগে ও যদি দিল্লিতে আসে তা হলে অমলবাবুর চিঠি এত দেরিতে পৌঁছল কেন আপনার কাছে ? ও যদি সরাসরি দিল্লি থেকে বাগডোগরাতে চলে আসত, তা হলে আপনি জানতেও পারতেন না, কারণ তখনও চিঠি আপনার কাছে পৌঁছতো না। অমলবাবু এমন ভুল নিশ্চয়ই করবেন না।" অবনীবাবুর কথায় যুক্তি ছিল।

"ঠিক। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না।"

"আপনি চিঠিটা গতকাল পেয়েছেন ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু কোথায় পোস্ট করা হয়েছে তা দেখিনি। ওটা দেখতে হবে।"

"আপনার কাছে যে-মেয়েটা এত মিথ্যে কথা বলছে, তাকে অমলবাবু কেন যে রেকমেন্ড করলেন, বুঝতে পারছি না।"

"জানি না। অমলদার সঙ্গে কীভাবে পরিচয় !"

অর্জুনের কথা শেষ না হওয়ার আগে হেডলাইটের আলো এগিয়ে এল। গাড়িটা বিপরীত প্রান্ত থেকে এলেও তিস্তা ভবনের গেটের সামনে থেমে যাওয়ায় ওদের জিপ পর্যন্ত হেডলাইটের আলো পৌঁছল না। পেছনের দরজা খুলে দু'জন নেমে পড়ল।

অথচ যাওয়ার সময় পেছনের আসনে একজনই ছিল এবং সে ডরোথি। ওরা গেট খুলে ভেতরে ঢুকে গেলে কালো অ্যাম্বাসাডর মুখ ঘুরিয়ে আবার গেটের সামনে পৌঁছল। অর্থাৎ ডরোথিকে কেউ একজন পৌঁছে দিতে গেল।

অর্জুন বলল, "চৌকিদার আবার বলে না দেয় !"

অবনীবাবু মাথা নাড়লেন, "লোকটা মরে গেলেও মুখ খুলবে না। ব্যবস্থা করেছি।"

মিনিট দুয়েকের মধ্যে লোকটা ফিরে গেট বন্ধ করে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। অবনীবাবু ইঞ্জিন চালু করলেন, "ওদের অনুসরণ করা যাক।"

"আমার মনে হচ্ছে ওরা শিলিগুড়িতে ফিরে যাবে।"

"এক শহরে থাকছে না বলছেন ?"

"হ্যাঁ। বোধ হয় সেটা সন্দেহ এড়াতে।"

www.boiRboi.blogspot.com

"তা হলে তো বেশ কষ্ট করতে হচ্ছে। যেতে-আসতে দেড় ঘণ্টা।"

কালো অ্যাম্বাসাডারটা এখন বেশ জোরে ছুটছে। অবনীবাবু অনেকটা দূরত্ব রেখে ওটাকে অনুসরণ করছিলেন। ক্রমশ কদমতলার মোড় ঘুরে শান্তিপাড়ার মোড় হয়ে গাড়িটা শিলিগুড়ির পথ ধরতে অবনীবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন, "আর যাওয়ার কোনও মানে হয় না। এখন ওদের আটকে কোনও লাভ নেই।"

রায়কতপাড়ার মোড়ে ল্যাংড়া পাঁচুকে বাইক থেকে নামিয়ে অর্জুন যখন বাড়ি ফিরে এল, তখন মধ্যরাত। মা জেগেই ছিলেন। খানিকটা বকুনি খেল সে। দেরির কারণ যে ডরোথি, এটা বলতে কোথায় বাধল। মা যদি বোঝেন কেউ অসৎ, তা হলে তার জন্য কোনও কাজ করবেন না। ডরোথির সঙ্গে আগামী কালও তাকে ভাল ব্যবহার করতে হবে, দুপুরে খাবার পৌঁছে

দিতেও হবে। জানলে মা খাবারটা তৈরি করে দেবেন না। অতএব বকুনি হজম করতে হল অর্জুনকে।

টেবিলে অমলদার চিঠিটা পড়ে ছিল। সেটাকে তুলে খামের গায়ে স্ট্যাম্প দেখতে গিয়ে মাথা নাড়ল অর্জুন। চিঠিটা পোস্ট করা হয়েছে কলকাতার পার্ক স্ট্রিট অঞ্চল থেকে। টিকিটগুলো ভারতবর্ষের। অর্থাৎ ডরোথি অমলদার কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে এসে কলকাতা থেকে পোস্ট করেছে। চিঠিটা যখন সে পড়েছিল তখন আর খামটা খেয়াল করেনি। চিঠির ওপর 'লন্ডন' এবং তারিখ আছে। তারিখটা ডরোথি রওনা হওয়ার দু'দিন আগের। খামের ওপর অর্জুনের ঠিকানা টাইপ করে বসানো। আর খামটাও বিদেশি, এ-দেশের স্ট্যাম্প বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ওপরে। এটা নিশ্চয়ই আগে থেকে পরিকল্পনা করেই করা হয়েছে। কথা হল, অমলদা কেন নিজে পোস্ট না করে ডরোথির হাতে তুলে দিলেন ?

রাত্রে ভাল ঘুম এল না। বারংবার মনে হচ্ছিল ডরোথি তাকে যেমন প্রতারণা করেছে, অমলদাকেও তেমনই। কিন্তু কেন সেটা করতে গেল ? বোঝা যাচ্ছে, তারিণী সেন এখন ওর লক্ষ্য। এখন, না আগে থেকেই ? নোটবুকে ওই নামটার চার পাশে বাক্স আঁকা আছে। অর্থাৎ ডরোথি আগেই জানত যে, বাক্সটা মূল্যবান। আর ওই বাক্সের গায়ে কমলাকান্ত রায়ের নামের পাশ থেকে একটা লাইন নামানো হচ্ছে। তার মানে কি কমলাকান্ত রায়ের সঙ্গে তারিণী সেনের কোনও যোগাযোগ ছিল ? মুশকিল হচ্ছে তারিণী সেনের আর্থিক এবং শারীরিক অবস্থা যা, তার জন্য লন্ডনের কোনও ইংরেজ মহিলার কোনও উদ্বেগ থাকা তো অস্বাভাবিক, ক্ষমাটমা চাওয়ার ব্যাপারটা এখন নেহাতই একটা

আড়াল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে অর্জুন সোজা রওনা হল তিস্তা ভবনের দিকে। খুব হালকা রোদ উঠেছে আজ। বাতাস বইছে চমৎকার। তিস্তা' ভবনের বাগানে ডরোথিকে দেখতে পাওয়া গেল। একটা গাছের পাতা খুব মন দিয়ে লক্ষ করছে। বাইকের আওয়াজে বোধ হয় তার চমক ভাঙল। অর্জুন 'গুড মর্নিং' বলতে সে হেসে সাড়া দিল।

"ঘুম হয়েছিল ?"

"নাঃ। নিজের বিছানার অভ্যেস বড় খারাপ। যাকগে, আমরা কখন যাব ?"

"বিকেলে। গতকাল ডাক্তার তো সে রকমই বলল।"

"ওকে দেখে মনে হচ্ছে, এখনই কোনও হাসপাতালে ভর্তি করা উচিত।"

www.boiRboi.blogspot.com

"ঠিক আছে, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করব। উনি যদি বলেন, তা হলে করা যাবে।"

"দেখে আমার এত ভয় করছিল ! যদি আজ পর্যন্ত বেঁচে না থাকেন তা হলে আমার এখানে আসাই বৃথা হবে।" ডরোথি হাঁটতে লাগল।

"তা তো হবেই। অন্য দুজন মারা গিয়েছেন আগে, তারিণীবাবু এখনও বেঁচে আছেন, ওঁর সঙ্গে তোমার কথা হওয়া দরকার।"

"কথা মানে দাদুর হয়ে ব্যাপারটা জানানো। ব্যস।"

"ব্রেকফাস্ট করেছ ?"

"নাঃ। একটু পরে করব। তুমি ?"

"আমি খেয়ে বেরিয়েছি।"

"তোমাকে আমার জন্যে কষ্ট করতে হচ্ছে !"

"আরে না। অমলদার আদেশ আমার শিরোধার্য। তা ছাড়া

পাবলিক স্থাপিত-১৮২৭

তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর আমার ভালই লাগছে।"

"ধন্যবাদ। তুমি কখনও বিদেশে গিয়েছ?"

"তা গিয়েছি। হিথরো এবং কেনেডি এয়ারপোর্ট দেখা হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি?" অবাক হয়ে তাকাল ডরোথি। যেন এতটা আশা করেনি সে। জিজ্ঞেস করল, "বেড়াতে গিয়েছিলে?"

"ওই আর কি!" অর্জুন হাসল, "এখন কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে আছে?"

"নাঃ। বইটা শেষ করব। খুব ইন্টারেস্টিং।"

"ক্রাইম থ্রিলার?"

"হ্যাঁ।"

"জলপাইগুড়িতে একসময় খুব ক্রাইম হত। এখানকার পুলিশের খুব নাম আছে।"

"তাই নাকি?" ডরোথি তাকাল।

"হ্যাঁ। ক'দিন আগে হাইওয়ে থেকে ওরা কুখ্যাত ক্রিমিন্যালদের ধরেছে।"

"ও।" ডরোথি মুখ ঘুরিয়ে নিল।

"একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেসা করা হয়নি। মিস্টার অমল সোমের সঙ্গে তোমার কীভাবে আলাপ হল? উনি কি এখন লন্ডনেই থাকেন?"

"আমি ওঁকে ঠিক জানি না। আমার এক আত্মীয় ওঁকে চেনেন। আমি ইন্ডিয়ার এদিকটায় আসতে চাই শুনে উনি মিস্টার সোমের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ওই একবারই দেখি ওঁকে। আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছিলেন এই পর্যন্ত।"

আরও কিছুক্ষণ অনাবশ্যক কথাবার্তা চালিয়ে অর্জুন বিদায় নিল। ঠিক হল, বিকেল হওয়ার আগেই ওরা রওনা হবে। দুপুরে

লাঞ্চ নিয়ে অর্জুনকে আসতে নিষেধ করল ডরোথি। আজ ওর খাওয়ার ইচ্ছে নেই। দরকার হলে এখান থেকেই টোস্ট আর ওমলেট খেয়ে নেবে। মেয়েটাকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল এখন।

বাড়ি ফিরে মাকে খাবার তৈরি করতে নিষেধ করে ছ'টা লুচি, বেগুনভাজা আর মিষ্টি পেটে পুরল অর্জুন। ডরোথির মুখটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। কী চমৎকার অভিনয় করে গেল মেয়েটা! গত রাতে বেরিয়ে আসার কথা বেমালুম চেপে গেল। অর্জুন এখানকার পুলিশের কৃতিত্বের বর্ণনা করায় অন্যমনস্ক হয়েছিল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। ডরোথি কোনও একটা গোপন কাজে সঙ্গী নিয়ে এসেছে এটা স্পষ্ট, কিন্তু কাজটা কী, তা বুঝতে পারছে না সে।

www.boiRboi.blogspot.com

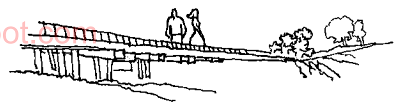

সাড়ে আটটা নাগাদ অর্জুন শহর ছেড়ে তিস্তা ব্রিজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ডরোথিকে নিয়ে বিকেলে যাওয়ার আগে তাকে একবার পূর্বদহ থেকে ঘুরে আসতেই হবে। তার সামনে ডরোথি এমন কোনও কাজ করবে না বা বলবে না, যাতে ওর উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। তারিণী সেনের সঙ্গে তাই আগেভাগে কথা বলে আসতে চায় সে। হয়তো কোনও লাভ হবে না। ডাক্তারবাবু বলেছেন আজ দুপুরের আগে তারিণী সেন কথা বলার মতো অবস্থায় নাও থাকতে পারেন, তবু একটা চেষ্টা করতে দোষ কী! ময়নাগুড়ি থেকে কিছু ফল কিনে নিয়ে হুচলুডাঙা হয়ে পূর্বদহর দিকে যেতে

যেতে সে বাইক দাঁড় করালো। ডাক্তারবাবু আসছেন সাইকেল চালিয়ে। ওকে দেখে তিনি নেমে দাঁড়ালেন। হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

"এই এলাম।" অর্জুনও হাসল।

"না, না। আপনার কথা বলছি না। হঠাৎ দেখছি তারিণী সেনকে নিয়ে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। একটু আগে বিডিও সাহেব লোক পাঠিয়েছিলেন। তারিণী সেন যদি অসুস্থ হয়ে থাকেন তা হলে তাঁকে এক্ষুনি ময়নাগুড়ি নয়, জলপাইগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। আমার কাছে জানতে চেয়েছেন। আমি বলে দিলাম আজ উনি একটু সুস্থ। তবু ভাবলাম বিডিও সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাই।"

"বিডিও সাহেব জানলেন কী করে?"

"আমি ভাবলাম আপনারাই জানিয়েছেন। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। এত বছর মানুষটা নানান অসুখে ভুগেছে, আধপেটা খেয়ে কোনওমতে বেঁচে আছে, অথচ কেউ কোনও খবর নেয়নি। হঠাৎ এখন ভি আই পি ট্রিটমেন্ট পাওয়ার কারণটা কী?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না। আমরা বিডিওকে কিছু জানাইনি।'

"আর একটা ব্যাপার। বিডিও সাহেব আমাকে দেখা করতে বলেছেন।"

"কেন?"

"সেটা না গেলে জানতে পারব না।"

"বেশ। আপনি ঘুরে আসুন। আপনার না ফেরা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।"

ডাক্তারবাবু সাইকেলে চেপে চলে গেলে অর্জুন খানিকক্ষণ সেই মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। ব্যাপারটা অবাক হওয়ার মতোই!

মের এককোণে পড়ে থাকা এক অথর্ব বৃদ্ধ যদি রাতারাতি খ্যাত হয়ে ওঠে, তা হলে লোকে তো অবাক হবেই! কিন্তু ডিও কেন এমন উৎসাহী হলেন? তারিণী সেনকে হাসপাতালে র্তি করলে কার লাভ হবে?

মন্দিরের সামনে এসে গতকালের সেই লোকটাকে দেখতে পেল অর্জুন। দু' হাত জড়ো করে নমস্কার করল সে। অর্জুন ইক থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করল, "কী খবর?"

"আমাদের আর খবর! এখন তো তারিণী জ্যাঠার কপাল খুলল। আজ সরকার থেকে লোক এসেছিল ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। গতকাল আপনারা না এলে এটা হত না।"

"উনি কেমন আছেন?"

"কাল ওষুধ পড়ায় আজ বেশ ভাল। মেমসাহেব আসেননি কেন?"

"বিকেলে আসবেন। চলুন।"

www.boiRboi.blogspot.com

হঠাৎ যেন গুরুত্ব পেল লোকটি। জিজ্ঞেস করল পাশে হাঁটতে-হাঁটতে, "ওটা কী?"

"আঙুর, মুসুম্বি।"

"বাব্বা! আমি কখনও ওসব খেয়েছি কিনা মনে পড়ে না।"

অর্জুন জবাব দিল না। গ্রামের মানুষদের দু'বেলা ভাত জোটাতে হিমশিম খেতে হয়, সেখানে এইসব ফল তো নাগালের বাইরে থাকবেই।

হঠাৎ লোকটি জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বাবু, হঠাৎ আপনারা জ্যাঠাকে নিয়ে এত ভাবছেন কেন বলুন তো? আমি তো জ্ঞান হওয়া ইস্তক জ্যাঠার কাছে কাউকে আসতে দেখিনি। আগে মাঝে-মাঝে ময়নাগুড়িতে যেত। এখন তো সেই ক্ষমতাও নেই।"

"তোমার কীরকম জ্যাঠা হয় ?"

"জ্ঞাতি সম্পর্কের।"

"ওঁর সম্পর্কে কিছু জানো ?"

"শুনেছি এককালে ডাকাতি করত। সেইজন্যে ইংরেজরা ওর হাত কেটে দিয়েছিল। এসব শোনা কথা।"

ওরা তারিণী সেনের বাড়ির সামনে পৌঁছে গিয়েছিল। দূর থেকেই অর্জুন দেখতে পেল তারিণী সেন দাওয়ার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। বৃদ্ধাদের মধ্যে যাঁর বয়স বেশি, তিনি একটা বাটিতে কিছু দিলেন তারিণী সেনের সামনে। দ্বিতীয়া বৃদ্ধাকে দেখা গেল না। লোকটি কাছে গিয়ে চিৎকার করল, "অ জ্যাঠা, কাল যে বাবুটি এসেছিলেন তিনি আবার এসেছেন।"

তারিণী সেন চোখ পিটপিট করলেন। ওঁকে আজ একটু ভাল দেখাচ্ছে। অর্জুন পা ঝুলিয়ে দাওয়ায় বসে প্যাকেটটা এগিয়ে দিল, "আপনার জন্যে নিয়ে এলাম। অসুখের সময় খেলে ভাল লাগবে।"

তারিণী সেন প্যাকেটটার দিকে তাকালেন। কিন্তু কিছু বললেন না। অর্জুন দেখল বাটিতে মুড়ি রয়েছে খানিকটা। অর্জুন বৃদ্ধাকে বলল, "ওর মধ্যে আঙুর আছে। একটু ওঁকে দিন। মিষ্টি আঙুর। আর মুসুম্বির রস করে দেবেন।"

লোকটি হাসল, "রাজভোগ গো জেঠি। আমাকে একটু দিয়ো। জীবন সার্থক করি।"

বৃদ্ধা যেন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে প্যাকেটটা তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আজ কেমন আছেন ?"

"ভাল।" মিনমিনে আওয়াজ বের হল তারিণী সেনের গলা থেকে।

"আমি জলপাইগুড়িতে থাকি।" অর্জুন কথা খুঁজছিল।

লোকটি বলে উঠল, "খুব ভাল মানুষ। আপনার জন্যে ফল এনেছেন। হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেছেন।"

হঠাৎ ঘন-ঘন মাথা নাড়তে লাগলেন তারিণী সেন। সরু গলায় কান্নার সুরে বলতে লাগলেন, "না, না। যাব না। আমি হাসপাতালে যাব না।"

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "কেন যাবেন না ?"

"আমি কোথাও যাব না। এখান থেকে কোথাও না।" তারিণী সেন প্রতিবাদ করছিলেন।

অর্জুন ভয় পেল, বৃদ্ধ এর ফলে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। সে বলল, "আপনাকে কেউ হাসপাতালে নিয়ে যাবে না। আপনি এখানেই থাকুন। ওষুধ খান ঠিকমতো। খাবেন তো ?"

বৃদ্ধ শিশুর মতো মাথা নাড়লেন।

আজও কিছু কুচো উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তবে গতকাল ডরোথি সঙ্গে থাকায় যে ভিড় জমেছিল, তা আজ হয়নি। অর্জুন লোকটিকে বলল, "আপনি একটু মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন ? ডাক্তারবাবু ফিরে আসামাত্র ওঁকে এখানে নিয়ে আসবেন।"

লোকটি ভেতরের দিকে তাকাল। সেখান থেকে বৃদ্ধা একটা ভাঙা প্লেটে অনেকটা আঙুর নিয়ে বের হয়ে এলেন। বৃদ্ধের সামনে রেখে বললেন, "খান।"

অর্জুন দেখল লোকটির চোখ চকচক করছে। ওকে সরাতে হলে একটু আঙুর দেওয়া দরকার। সে কিছু বলার আগেই বৃদ্ধা তাঁর বাঁ হাতের মুঠো আলগা করে লোকটার সামনে ধরতেই সে খপ করে সেখান থেকে গোটা চারেক আঙুর তুলে নিল। একটা মুখে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বলল, "আহা ! অমৃত।"

www.boiRboi.blogspot.com

"এবার তা হলে যান !" অর্জুন হেসে বলল।

মাথা নেড়ে লোকটা যেতে-যেতে বাচ্চাদের ধমকে দিল, "অ্যাই ! হ্যাট-হ্যাট। যা এখান থেকে। কেউ কাছে যাবি না। যাঃ।"

তারিণী সেন কিছুই খাচ্ছিলেন না। অর্জুন বৃদ্ধাকে বলল, "আপনি ওঁকে খাইয়ে দিন।" বৃদ্ধা যেন লজ্জা পেলেন। তারপর পাশে উবু হয়ে বসে প্লেট থেকে একটা আঙুর তুলে তারিণী সেনের মুখে গুঁজে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তারিণী সেনের চোয়াল নড়তে লাগল। রসের স্বাদ পেতে নিজেই হাত বাড়ালেন। অর্জুন অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখল। হাতে পাঞ্জা নেই। কবজির কাছেই তা আচমকা শেষ। অথচ সেই দুটো হাত একত্রিত হয়ে দুটো আঙুর তুলে নিল অদ্ভুত কায়দায়। জাপানিরা কাঠি দিয়ে ভাত খায়। তারিণী সেন কবজিবিহীন দুই হাতে আঙুর তুলছেন আর মুখে পুরছেন। হয়তো ওইভাবে ইনি ভাত অথবা মুড়িও খেতে পারেন। অভ্যেসে মানুষ কী না করতে পারে ! সে চেষ্টা করলেও কাঠি দিয়ে দুটো দানার বেশি ভাত তুলতে পারবে না একবারে !

অর্জুন তারিণী সেনের দিকে তাকাল। ইনি এমন একটা বয়সে পৌঁছে গেছেন, যেখানে গেলে কোনও বিষয় নিয়ে আর তেমন আগ্রহ থাকে না বলে অর্জুন শুনেছে। ওঁর বসার ভঙ্গি, তাকানো যেন সেই কথাই বলে। হঠাৎ তারিণী সেন বললেন, "আজ শরীর ভাল।"

কথাটা লুফে নিল অর্জুন, "আপনাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে।"

"খেতে পাই না, পরতে পাই না, তবু বেঁচে আছি। এই লুঙ্গিটাও ছিঁড়ে গেছে।"

এমন কথার পেছনে কোনও কথা মুখে আসে না। অর্জুন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। একটা কাক দাওয়ার কাছে এসে খুব চেঁচাচ্ছিল। তারিণী সেন হাত তুললেন, "যাঃ, যাঃ।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "পুরনো দিনের কথা আপনার মনে পড়ে ?"

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন তারিণী সেন। তারপর ফোকলা দাঁতে হাসলেন, "আমি তখন ডাকাত ছিলাম। সবাই ভয় পেত।"

একেবারে শিশুর মতো কথা। ডাকাতি যে অপরাধকর্ম, তাও খেয়াল নেই।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি ডাকাতি করতেন কেন ? কাজটা তো ভাল না।"

তারিণী সেন চোখ বন্ধ করলেন। যেন কিছু ভাবলেন। তারপর বললেন, "এক কাহন বলতে গেলে সাত কাহন গাইতে হবে। আঙুরগুলো খুব মিষ্টি ছিল। অ্যাই দাও না, আর একটু আঙুর দাও না।" বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বায়না করলেন তিনি।

www.boiRboi.blogspot.com

অর্জুন বলল, "বাকিটা বিকেলে খাবেন। আমি আরও এনে দেব।"

তারিণী সেন বললেন, "দেবে তো ? ঠিক ? মনে করে দিয়ো। তুমি ছেলেটা দেখছি বেশ ভাল। আমাকে অনেক বছর কেউ কিছু দেয়নি।"

"ওই ডাকাতির ব্যাপারটা !" অর্জুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল।

"বাপ গরিব ছিল। খুব গরিব। আমি চাষ করতাম। তাতে পেট ভরত না। কত বয়স হবে তখন ? বড়জোর এক কুড়ি। বোনের বিয়ে ঠিক হল ধূপগুড়িতে। ধারধোর করে বাপ তাদের খাঁই মেটালো। কিন্তু বিয়ের দিন বরের বাপ জানালো সাইকেল দিতে হবে, নইলে ছেলে আসবে না। সাইকেল কোথায় পাব ?

মড়াকান্না শুরু হয়ে গেল। হাঁটতে-হাঁটতে ধূপগুড়ি গেলাম। বরের বাপের পায়ে পড়লাম। সে কসাই, রাজি হয় না কিছুতেই। ফিরে আসছি, এমন সময় দেখলাম একজন সাইকেল চালিয়ে আসছে নির্জন রাস্তা ধরে। রোগা লোক। মনে হল বোনের সম্মান বাঁচাতে ওটাই নিয়ে নিই। কোনও দিন অমন কম্ম করিনি। কিন্তু সেদিন করে ফেললাম। সাইকেল পৌঁছে দিয়ে এলাম বরের বাড়িতে। লোকটাকে একটু বেশি মারতে হয়েছিল। অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল পথের ধারে। কিন্তু বোনের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু কী করে জানি লোকটা আমায় চিনে ফেলেছিল। তিন দিন বাদে পুলিশ এল আমাকে ধরতে। আমি পালালাম। জঙ্গলে যখন লুকিয়ে আছি তখন আলিবক্সের দলের সঙ্গে যোগাযোগ হল। নিজেকে বাঁচাতে তার দলে যোগ দিলাম। ওই আলিবক্স আমাকে শিখিয়ে দিল কী করে লাঠি, ছুরি চালাতে হয়, এক কোপে গলা নামাতে হয়। মনে দয়া রাখলে সেটাই যে কাল হবে, তাও শিখলাম। আলিবক্স মারা গেলে আমাকেই সর্দার বানালো সবাই। গরিবদের কিছু বলতাম না। কিন্তু যার বেশি আছে তাকে ছাড়তাম না। ওই বার্নিশ পর্যন্ত আমাকে ভয় পেত না এমন মানুষ খুঁজে পাবে না। আমার একটা সাদা টাট্টু ঘোড়া ছিল। তার আওয়াজ শুনলেই সবাই ঝাঁপ দিত ঘরে। ওই যে আমার বউ, ও হল প্রথম পক্ষের। বাপ দিয়েছিল এনে। ওর সঙ্গে ঘর করতে পারিনি কত বছর। দ্বিতীয় বউটাকে বিয়ে করতে হল চাপে পড়ে। ওকে চিনতাম না। বিয়ের ঠিক করেছিল ওর বাপ এক পাষণ্ডের সঙ্গে। পাওনাগণ্ডা পায়নি বলে বিয়ের দিন আসেনি। আমি সে সব জানতাম না। বিয়েবাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে শুনি এই অবস্থা। সঙ্গে-সঙ্গে বরকে ধরতে লোক পাঠালাম। সে-ব্যাটা আমি গিয়ে পড়েছি শুনে একেবারে

হাওয়া। এবার মেয়ের কী হবে? আমি বললাম, ঠিক আছে, আমিই নাহয় উদ্ধার করছি। সে বড় ভাল দিন ছিল।”

জোরে-জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন তারিণী সেন।

অর্জুন তাঁকে একটু সময় দিয়ে বলল, “বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না?”

“না। ও-ব্যাটারা যে কী চায় তাই বুঝতাম না। কোনও কালে যোগ না থাকলে ভালই হত। একবার লাটাগুড়ির জঙ্গলে একজনকে ধরলাম। মুখে দাড়ি, খেতে পায়নি অনেকদিন। বলল সে বিপ্লবী। ইংরেজদের তাড়াতে চায়। বলল, দেশকে স্বাধীন করবে। শুনতে-শুনতে কী রকম যেন হল। ওকে সঙ্গে নিয়ে ক'দিন ঘুরলাম। শিক্ষিত মানুষ। রোজগারপাতি না করে দেশ উদ্ধার করতে পুলিশের তাড়া খেয়ে বনবাদাড়ে ঘুরছে কেন, সেটাই বুঝতে চাইলাম। আর তাই ধরা পড়ে গেলাম পুলিশের হাতে।”

www.boiRboi.blogspot.com

“কী করে?”

“অমন লোক দলের সঙ্গে ঘুরুক তা কেউ-কেউ পছন্দ করছিল না। মাঝে-মাঝে লোকটা বার্নিশে যেত তার কাজে। আবার ফিরেও আসত। একদিন খোচড় এসে দেখে গেল ওর পিছু পিছু। তারপর পুলিশ এল ওকে ধরতে। ওকে বাঁচাতে গিয়ে আমি ধরা পড়ে গেলাম। তা ধরে করবে কী? নিয়ে গেল জলপাইগুড়ি। পুরে রাখল ক'দিন। কিন্তু কেউ সাক্ষী দিতে এল না আমার বিরুদ্ধে। আমি বেকসুর খালাস।”

“আপনি এর পরে ডাকাতি করা ছেড়ে দেন কেন?”

“সেই লোকটার জন্যে। ওই নাকি আমার জন্যে উকিল দিয়েছিল। সেই উকিলবাবু আমার ছাড়া পাওয়ার সময় বলেছিল আর ওসব করবেন না। অনেক তো হল। কথাটা মনে লেগে

গেল। দলের লোকজন চাইত না আমি বসে যাই। তারা আমাকে খুব উসকাতো। কিন্তু সেই লোকটা আমার সব খবর রাখতো। আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইত।"

"ওই লোকটা মানে সেই স্বাধীনতা সংগ্রামী, যাদের বিপ্লবী বলা হত ?"

অর্জুনকে অবাক করে তারিণী সেন ঘাড় নাড়লেন, "না, না। ওরা আলাদা লোক। একজন এদেশি আর অন্যজন সাহেব। লাল গোরা। পুলিশরা সেলাম করত।"

"এই লাল গোরার নাম কি ম্যাকসাহেব ?"

"হ্যাঁ। তুমি কী করে জানলে ? তখন তো জন্মাওনি বাপ !"

"শুনেছি। আর যিনি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন তাঁর নাম কী ?"

"কমলবাবু। লোকটা ভাল ছিল গো।"

"তা আপনাকে ছাড়াল কে ?"

"ওই গোরাসাহেব। ওই উকিল ঠিক করে দিয়েছিল।"

"গোরাসাহেব দেশের শত্রু ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর কাজ ছিল অপরাধী ধরা। তিনি কেন আপনাকে বাঁচাতে গেলেন ?"

তারিণী সেন মাথা নাড়তে লাগলেন, সঙ্গে ফিকফিক হাসি, "সাহেবের খুব লোভ ছিল, তাই।"

"কিসের লোভ ?"

"বাটপাড়ি করার লোভ। চোরের ওপর বাটপাড়ি। সাহেব জানত, আমি অনেক ডাকাতি করেছি। অনেক সোনাদানা। একবার তিব্বতের, ওই যে কী বলে, তিব্বতের সাধুদের একটা দল যাচ্ছিল, তাদের ওপর ডাকাতি করে অনেক ধনসম্পত্তি পেয়েছিলাম। সোনাদানা ছাড়াও কালো পাথরের ভারী মূর্তি ছিল ওদের সঙ্গে। দুটো লোককে খুন না করে তার দখল পাইনি।

গোরাসাহেব ওই মূর্তির জন্যে আমার কাছে আসত। ওই বার্নিশের জঙ্গলে সে দেখা করত আমার সঙ্গে। আমাকে যখন পুলিশ ধরল, তখন সে ছাড়িয়েছিল ওই এক শর্তে। ছাড়া পাওয়ার লোভে আমি তখন রাজি হই। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে মনে হল যদি মূর্তিটা দিয়ে দিই, সাহেব আমাকে ছিঁড়ে খাবে।"

"মূর্তিটা বিক্রি করে দিয়েছিলেন ?"

"কে কিনবে ? অদ্ভুত মূর্তি ! দেবদেবীর না। সোনাদানা সব ফক্কা হয়ে গিয়েছিল।"

"মূর্তিটা নিয়ে কী করলেন ?"

"পুঁতে রেখেছি।"

অর্জুন এবার সোজা হয়ে বসল, "আপনার হাত দুটো কাটা গেল কী করে ?"

হঠাৎ কেমন অবসন্ন দেখাল তারিণী সেনকে। সম্ভবত অনেকক্ষণ কথা বলার ধকল তিনি সামলাতে পারছিলেন না। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বললেন, "ম্যাকসাহেব কেটে দিয়েছে।"

www.boiRboi.blogspot.com

"সে কী ! আমরা শুনেছিলাম বিপ্লবীরা বদলা নিয়েছে। আপনি তাদের ধরিয়ে দিতেন।"

"মিথ্যে কথা ! কমলাকান্তকে দোমহনির সরকারি বাড়িতে প্রচণ্ড মার মেরেছিল ম্যাকসাহেব। আমি তাকে লুকিয়ে দু' হাতে নিয়ে ছুটে যাই তিস্তার নৌকো ধরতে। সেই অপরাধে ম্যাকসাহেব আমাকে বলল, যদি আমি মূর্তিটা ওকে না দিই তা হলে আমার হাত কেটে দেওয়া হবে। লোকটা যত আমার কাছে মূর্তিটা চাইত, তত আমার রোখ চেপে যেত। আমি রাজি হলাম না। ও আমার হাত কেটে দিল দোমহনির লালকুঠিতে ধরে নিয়ে গিয়ে।"

যেন সহজ-সরল একটা কাজের কথা বললেন তারিণী সেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ম্যাকসাহেব মূর্তিটার কথা জানলেন কী

করে ?”

"তিব্বতিরা বলেছে।”

"ঠিক আছে। আপনি এখন বিশ্রাম করুন।” অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

"কাল নাকি এক গোরা মেম এসেছিল ?”

"হ্যাঁ। মেয়েটি ম্যাকসাহেবের নাতনি। আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে।”

অদ্ভুত মুখ করে তাকালেন তারিণী সেন। তারপর বললেন, "গোরাসাহেবের নাতনি আমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে ? হায় ভগবান ! এমনও হয় ?”

অর্জুন বলল, "আমাকে তো তাই বলেছে। আচ্ছা, ও যদি আপনার কাছে মূর্তিটার হদিস চায় তা হলে ওকে তা দেবেন ?”

তারিণী সেন হাসলেন। রহস্যময় তাঁর হাসি। ছড়া কেটে বললেন, "কালোর সঙ্গে লাল আর লালের মধ্যে কালো/ ভক্তিভরে তারে নমো করাই ভালো। আমি ভুলেই গেছি কোথায় রেখেছি।”

অর্জুন দেখল সেই লোকটির সঙ্গে ডাক্তারবাবু আসছেন। সে জিজ্ঞেস করল, "কথা হল ?”

"হ্যাঁ। এই যে তারিণীবাবু, কেমন আছেন ? নাড়িটা দেখি ?”

ভদ্রলোক নিজেই বৃদ্ধের হাত তুলে নিলেন, "একটু দুর্বল দেখছি। খুব কথা বলেছেন মনে হচ্ছে। যান, ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি ওষুধ এনেছি, কোনও চিন্তা নেই।”

অর্জুন বলল, "হাসপাতালে যেতে হবে না, এই তো ?”

"তাই তো বলে এলাম। বিডিও সাহেব খুব বলছিলেন। তাঁকে টেলিফোন করেছে শিলিগুড়ির এক ইনফ্লুয়েনশিয়াল ব্যবসায়ী। উনি যে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, তাই বিডিও

www.boiRboi.blogspot.com

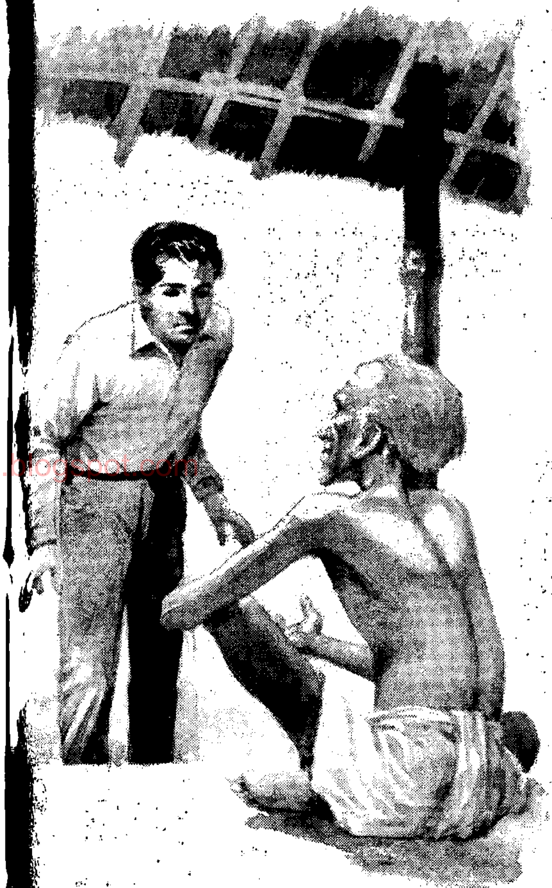

সাহেব জানতেন না। এরকম একটা লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন তা হতে দেওয়া যায় না। মুশকিল হল, আমিও জানতাম না উনি স্বাধীনতা সংগ্রামী। বিডিও সাহেবকে বলে এলাম যদি বুঝি দরকার, সঙ্গে-সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাব। একটু রিস্ক নিয়ে ফেললাম।"

অর্জুন বলল, "উনি নিজেও জানেন না যে ওঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বলা হচ্ছে। যাকগে, আপনি কাল চা খাওয়াবেন বলেছিলেন, আজ আমি যেচে খেতে চাইছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারবাবু চঞ্চল হলেন, "আরে, এ কী কথা! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। চলুন। এ তো আমার সৌভাগ্য!" ওরা তারিণী সেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

ডাক্তারবাবুর বাড়ি বেশি দূরে নয়। চেম্বারের সামনে কিছু রুগি বসে আছে। তাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে অর্জুনকে নিয়ে চেম্বারে ঢুকলেন তিনি। বোঝা যাচ্ছে বসার ঘরই চেম্বার। চায়ের হুকুম দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "এবার আমাকে বলুন তো ব্যাপারটা কী? আপনার মতো মানুষ এমন অজ গাঁয়ে বিনা কারণে আসতে পারেন না!"

অর্জুন জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। ফাঁকা মাঠ, মাঠের বুকে বড় মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে। সে হেসে বলল, "গতকাল আমি এসেছিলাম নেহাতই কর্তব্য করতে। ওই ইংরেজ মেয়েটি তারিণী সেনকে দেখতে চেয়েছিল, তাই ওকে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আজ পরিস্থিতি বদলে গেছে।"

"কীরকম?" ডাক্তারবাবু ঝুঁকে বসলেন।

"আজ মনে হচ্ছে তারিণী সেনের জীবন বিপন্ন। না, অসুখের জন্যে নয়, ও-ব্যাপারে আপনি আছেন। বিপন্ন তাঁর অতীতের কিছু কাজের জন্যে।"

"বিপন্ন কী করে বুঝলেন?"

"আচ্ছা ডাক্তারবাবু, যে-লোকটার খোঁজ কাল সকাল পর্যন্ত কেউ করত না, সে আজ বেশ ভি আই পি হয়ে গেল কী করে? আপনাকে বিডিও ডেকে পাঠাচ্ছেন ওঁর সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে। এখানকার গ্রামে-গ্রামে এমন অনেক বৃদ্ধ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন, কই, তাঁদের সম্পর্কে তো খোঁজ নেওয়া হচ্ছে না?"

"ঠিক। এটা আমাকে অবাক করেছে!"

"একজন ইংরেজ মহিলা এত দূরে কী কারণে আসবে, যদি না তার স্বার্থ থাকে?"

"ঠিকই। কিন্তু এর সঙ্গে জীবন বিপন্ন হওয়ার কারণ কী?"

"তারিণীবাবু এমন কিছু জানেন, যা জানতে এখন অনেকেই উৎসুক। বিডিও সাহেব স্রেফ অনুরোধে খোঁজখবর নিয়েছেন। কিন্তু তাঁকে যিনি অনুরোধ করেছেন, তিনি হয়তো উৎসাহী। তারিণী সেনকে এখান থেকে তুলে নিয়ে গেলে চাপ দিলে হয়তো খবরটা পাওয়া যাবে বলে ওদের ধারণা হতে পারে। এখন কথা হচ্ছে, তারিণী সেনকে বাইরের মানুষের চোখের আড়ালে রাখা উচিত। সেটা কীভাবে সম্ভব তা আপনারাই বলতে পারবেন!"

ডাক্তারবাবু বললেন, "কী সেই গোপন কথা, যা উনি জানেন বলে এসব হচ্ছে?"

"সেটা উনিই জানেন।"

হঠাৎ দূরে মাঠের প্রান্তে ধুলো উড়তে দেখা গেল। একটু ঠাওর করতেই অর্জুন বুঝতে পারল একটা গাড়ি আসছে এদিকে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের গ্রামে প্রায়ই গাড়ি আসে?"

"কালেভদ্রে। কেউ-কেউ মন্দির দেখতে আসে।"

এবার কালো অ্যাম্বাসাডারটা নজরে এল। অর্জুন একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, "ডাক্তারবাবু, আমার মনে হচ্ছে এরা মন্দির

www.boiRhoi.blogspot.com

দেখতে আসেনি। আপনার এখান থেকে পেছন দিক দিয়ে তারিণী সেনের বাড়িতে যাওয়ার কোনও পথ আছে?"

"হ্যাঁ আছে। কেন?"

"ওরা তারিণী সেনের খোঁজে এসেছে। আমি লোকটার জন্যে ভয় পাচ্ছি।"

ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন, "আমি দেখছি। ওরা যাতে দেখা না করতে পারে তার ব্যবস্থা করব।" ডাক্তারবাবু দ্রুত বেরিয়ে যেতে অর্জুনের খেয়াল হল তার বাইকটা মন্দিরের সামনেই পড়ে আছে। ওরা এমন একটা অজ পাঁড়াগায়ে বাইক দেখতে পেলে সন্দিগ্ধ হলেও হতে পারে। কালো অ্যাম্বাসাডার মন্দিরের সামনে দাঁড়ালে সেই গ্রাম্য লোকটি এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে মন্দির দেখিয়ে কিছু বলতে লাগল। অর্জুন বুঝল ও ওর কাজ করছে। গাড়ি থেকে নামল দু'জন মানুষ। দু'জনেই স্বাস্থ্যবান। একজনকে বিদেশি বলেই মনে হচ্ছিল। সে ক্যামেরা বের করে টপাটপ মন্দিরের ছবি তুলতে লাগল। দ্বিতীয়জন লোকটির সঙ্গে কথা বলছিল। এবার ডাক্তারবাবুকে এগিয়ে যেতে দেখল সে। লোকটির সঙ্গে ডাক্তারবাবুর কথা হচ্ছে। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে লোকটি ডাক্তারবাবুকে দিল। ডাক্তারবাবু সেটা পড়ে কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না, কারণ তিনি ঘন-ঘন এদিকে তাকাচ্ছিলেন। তারপর গ্রাম্য লোকটিকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারবাবু কিছু বলতেই সে ছুটে এদিকে আসতে লাগল। অর্জুন বুঝল ভদ্রলোক তার সঙ্গে পরামর্শ করতে চান, কিন্তু যে-কোনও বুদ্ধিমান মানুষ এই চালাকি ধরে ফেলবে। অথচ এখন কিছু করার নেই। লোকটি ঘরের দরজায় এসে বলল, "ওরা শিলিগুড়ি থেকে এসেছে। কেউ যেন তারিণী জ্যাঠার চিকিৎসার জন্যে এক হাজার টাকা পাঠিয়েছে। টাকাটা জ্যাঠার হাতে না

www.boiRboi.blogspot.com

দিতে পারলে ফেরত নিয়ে যাবে। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করছেন কী করবেন?"

অর্জুন বলল, "ডাক্তারবাবুকে বলো ওদের সঙ্গ না ছাড়তে আর কথা বলতে না দিতে।"

লোকটি আবার দৌড়ে চলে গেল। ওকে দেখে ডাক্তারবাবু এগিয়ে এসে মাথা নামিয়ে বক্তব্য শুনে ওদের ইশারা করলেন অনুসরণ করতে। একটু পরেই ওরা চোখের আড়ালে চলে গেল।

তারিণী সেনের কাছে একটি মূর্তি ছিল। কালো পাথরের মূর্তি, যা লোকটা তিব্বতি লামাদের ওপর ডাকাতি করে পেয়েছিল। ওই মূর্তি তারিণী সেন বিক্রি করতে পারেনি, কারণ সে-সময় ওই অঞ্চলে কোনও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ছাড়া অন্য মূর্তির চাহিদা ছিল না। অথচ বোঝা যাচ্ছে ওই মূর্তি যথেষ্ট মূল্যবান। মূল্যবান বলেই রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড ওটাকে পেতে চেয়েছিলেন। তারিণীকে হাতে রেখে ওটার হদিস পাওয়ার চেষ্টাও করেছেন। দেশে ফিরে গিয়ে নিজের ডায়েরিতে ওই মূর্তির কথা লিখে রেখে গেছেন, যা ডরোথি পড়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, ওই মূর্তির লোভেই সে গতবার দিল্লিতে এসে কয়েক জনের সঙ্গে যোগাযোগ করে। আর নেহাতই কাকতালীয়ভাবে অমল সোমের কাছে পৌঁছে গিয়ে তার নামে চিঠি লিখিয়ে নেয়। ডরোথি হয়তো এখনও জানে না তার পেশা কী! স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে ক্ষমা চাইতে আসার গল্প নেহাতই একটা আড়াল মাত্র। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ও এবং ওর দলের লোকজন বেশ সক্রিয়। ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি থেকে বিডিওকে ফোন করাবার মতো লোককে ওরা পেয়ে গেছে। এই যে হাজার টাকা দিতে আসা, এটাও একটা চাল। তারিণী সেনকে

সচক্ষে দেখে নিতে চায় ওরা, যাতে লোকটাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যেতে অসুবিধে না হয়।

এখন কী করা যায়? মূর্তিটা কোথায় আছে, তা তারিণী সেন ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। টাকার লোভে লোকটা কি বলে দেবে? অবশ্য টাকার লোভ থাকলে এত বছর প্রচণ্ড অভাবে থেকেও তারিণী সেন মূর্তিটার কথা কাউকে বলেনি। কেন?

কিছুক্ষণ পরে ওদের আবার দেখতে পেল অর্জুন। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল গ্রাম থেকে ধুলো উড়িয়ে।

অর্জুন বেরিয়ে এল। মন্দিরের দিকে কয়েক পা হাঁটতেই ডাক্তারবাবু এবং লোকটির মুখোমুখি হল। ডাক্তারবাবু বললেন, "ওরা চিকিৎসার জন্যে এক হাজার টাকা দিয়ে গেল।"

অর্জুন বলল, "ভালই তো! তারিণীবাবুর উপকার হবে।"

লোকটি বলল, "অত টাকা আমি জীবনে একসঙ্গে ধরিনি! তারিণী জ্যাঠার কপাল বটে! টাকা দেখে বুড়ো কিন্তু একটুও হইচই করল না। জেঠিকে দিয়ে দিল। ওরা ফোটো তুলল। দু-চারটে কথা বলল, কিন্তু জ্যাঠা কোনও জবাব না দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। কী মানুষ রে বাবা!"

ডাক্তারবাবু এসব কথায় কান দিচ্ছিলেন না। সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, "কী করা যায়?"

"লক্ষ রাখবেন। এই আর কি। ওরা কি শহরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল?"

"না। সেসব কিছু বলেনি।"

"আমি তো আবার বিকেলে আসছি মেমসাহেবের সঙ্গে। সে রকমই কথা হয়ে আছে।" অর্জুন সোজা বাইকে গিয়ে বসল। সে যখন নিজেই কিছু বুঝতে পারছে না তখন ডাক্তারবাবুকে কী

বলবে! অনেকটা দূরে এসে মুখ ফিরিয়ে সে দেখল মন্দিরটাকে দেখা যাচ্ছে। পাশের ছোট লাল মন্দিরটাও এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে। রাজারাজড়াদের তৈরি করা এইসব মন্দির দেখতে এখনও কেউ-কেউ আসেন। কিছু-কিছু মূর্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালায় নিয়ে গিয়েছেন। মন্দির দেখাবার সময় গতকাল লোকটি বলেছিল কুবের মূর্তি এবং বিষ্ণুপট্ট এখন সরকারের হেফাজতে। এখন তারিণী সেনের লুকিয়ে রাখা মূর্তি যদি পাওয়া যায় তা হলে তার স্থান হওয়া উচিত পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালা।

আবার চলতে শুরু করল অর্জুন। একটানা অনেক কথা বলে গেলেন তারিণী সেন। অত বছর আগের কথা ঠিকঠাক একজন অসুস্থ বৃদ্ধ বলবেন, এমন আশা করা ঠিক নয়। কিন্তু ওঁর হাতের পাঞ্জা ম্যাকসাহেব কেটে ফেলেছিলেন, এটা অবশ্যই নতুন তথ্য। দৃশ্যটি অবশ্যই ভয়ঙ্কর। নাৎসিদের অত্যাচার তো অমনই ছিল। সেই একই অত্যাচার করেছেন ডরোথির দাদু। সেটা কমলাকান্ত রায়কে সাহায্য করার জন্য না মূর্তি বের করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে, তা এখন আর জানা যাবে না। হয়তো মাথাগরম করেই, হাল ছেড়ে দিয়েই কাজটা করেছিলেন ম্যাকসাহেব। কিন্তু তাঁর যে আক্ষেপ থেকে গিয়েছিল, তা বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা ডায়েরিতে লিখে রাখায়। আর এতদিন পরে তাঁর নাতনি এসেছে ওই একই বস্তুর সন্ধানে।

ময়নাগুড়ির বাইপাসে এসে অর্জুন একবার ভাবল বিডিও সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা জানিয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে জলপাইগুড়িতে চলে এল। এখন ভর দুপুর। সোজা থানায় এসে দেখল অবনীবাবু দুটো লোককে প্রশ্ন করে চলেছেন। এরা চোরাশিকারি। জঙ্গলে ঢুকে অবৈধভাবে জন্তু-জানোয়ার মারে। অর্জুনকে দেখে ওদের সরিয়ে নিয়ে যেতে বলে তিনি

www.boiRboi.blogspot.com

জিজ্ঞেস করলেন, "কী খবর ?"

পুলিশের সবাইকে মন খুলে সব কথা বলা যায় না। কিন্তু অবনীবাবু অন্য রকমের মানুষ, অনেক বার তার প্রমাণ পেয়েছে অর্জুন। অতএব আজ সকাল থেকে যা-যা ঘটেছিল সব সে বলে গেল।

শোনা শেষ হলেই অবনীবাবুকে উত্তেজিত দেখাল, "এর পরেও বৃদ্ধ লোকটাকে ওখানে ছেড়ে এলেন ? না, না। এটা ঠিক কাজ হয়নি।"

"এখন কিছু করার নেই। আমার মনে হয় ডরোথি যাওয়ার আগে কিছু করবে না ওরা।"

"মেমসাহেবকে নিয়ে আবার তা হলে যাচ্ছেন ?"

"অবশ্যই।"

অবনীবাবু একটু চিন্তা করলেন। তারপর উঠে গেলেন একটা আলমারির কাছে। এই বই সেই খাতা খুলে দেখতে লাগলেন কিছু। অর্জুন লক্ষ করছিল ভদ্রলোককে। মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে অবনীবাবু বললেন, "নাঃ। হাতের কাছে নেই। ওপরে হয়তো পাব। পুরনো ইতিহাস ঘাঁটতে-ঘাঁটতে একবার যেন পড়েছিলাম তিব্বতি লামাদের আনা একটা মূর্তি ডাকাতির পর আর পাওয়া যায়নি খুঁজে। সেই সময় ব্রিটিশরা দাম দিয়েছিল হাজার পাউন্ড। এখনকার টাকায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার। পঞ্চাশ বছরে ওর দাম দিয়ে দাঁড়াবে এক কোটিতে। আপনার তারিণী সেন সেই মূর্তিটি কব্জা করে ভিখিরির মতো বাস করবেন, এমন মনে হয় না।"

"মূর্তিটা থেকে অত টাকা পাওয়া যাবে এমন আন্দাজ বৃদ্ধ মানুষটার নেই।"

"কিন্তু এটা যে মূল্যবান, তা নিশ্চয়ই জানত, নইলে পুঁতে

রাখবে কেন ?"

"ম্যাকসাহেব চাইছেন, দিয়ে দিলেই প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে, নিজেকে দামি করতে তারিণী সেন মূর্তি হাতছাড়া করতে চাননি।" হঠাৎ তারিণী সেনের বলা ছড়া মনে পড়ে গেল অর্জুনের। সে টেবিল থেকে একটা কাগজ নিয়ে ঠিকঠাক লেখার চেষ্টা করল।

অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী লিখলেন ?"

অর্জুন কাগজটা এগিয়ে দিল। অবনীবাবু পড়লেন, " 'কালোর সঙ্গে লাল আর লালের মধ্যে কালো, ভক্তিভরে তারে নমো করাই ভালো'। এর মানে কী ?"

"আমি জানি না। মূর্তিটা কোথায় পুঁতেছেন জানতে চাইলে, বলছেন ভুলে গিয়েছি। তার আগে ওই কথাগুলো সুরে বললেন।"

"বেশ হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। কোনও মানে পেয়েছেন ?"

"এখনও না।"

"দুর মশাই। এটা তো সিম্প্‌ল। কালোর সঙ্গে লাল। তারিণী সেনের গায়ের রঙ নিশ্চয়ই কালো আর ম্যাক সাহেবের অবশ্যই লাল। তাই কালোর সঙ্গে লাল। ম্যাকসাহেব তারিণীর সঙ্গে আছেন। আর লালের মধ্যে কালো। তারিণী ম্যাকের মধ্যে আটকে গেছে। এক্ষেত্রে সাহেবকে শ্রদ্ধা করলে প্রাণ বাঁচবে। এই তো।"

অর্জুন হেসে ফেলল, "এর সঙ্গে মূর্তির কী সম্পর্ক ?"

অবনীবাবু গম্ভীর হলেন, "হুঁ। তা অবশ্য। তবে লাল-কালো মানে ইংরেজ এবং আমরা।"

"আমার তো মনে-হয় না। তারিণী সেন একজন রাজবংশী। ওঁর গায়ের রং এই বয়সেও বেশ ফরসা। কালো কখনই বলা

www.boiRboi.blogspot.com

যাবে না।"

"আহা, ইংরেজদের তুলনায় তো কালো ?"

"আমি উঠলাম।" অর্জুন উঠে পড়ল।

"আপনি কি ফিরে এসে থানায় ঢুঁ মারবেন ?"

"বলতে পারছি না। আপনি কি ময়নাগুড়ি থানায় আমার কথা বলে রাখবেন ? ইন কেস অফ এনি হেল্প। আজ রাত্রে দরকার হলেও হতে পারে !"

"নিশ্চয়ই। তা ছাড়া ওখানকার ও সি আপনাকে বিলক্ষণ চেনেন। আমার জুরিসডিকশন নয়, তবু মনে হচ্ছে যেতে পারলে ভাল লাগত।"

"আসুন না !" অর্জুন বেরিয়ে এল।

স্নান-খাওয়া সেরে অর্জুন প্রথমে সুধীর মৈত্রের বাড়িতে গেল। ভদ্রলোক তাঁর পড়ার ঘরেই ছিলেন। চশমা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপার কী ?"

www.boiRboi.blogspot.com

"অসময়ে এলাম !"

"আমার কাছে সবসময়ই ঠিক সময়। শুধু রাতদুপুর ছাড়া।"

"কেউ আর বিরক্ত করেনি তো ?"

"না।"

"আচ্ছা, জলপাইগুড়ির পুরনো দিনের মূর্তি নিয়ে আপনি নিশ্চয়ই কিছু জানেন।"

"না। আমি আলাদা করে কিছু জানি না। বইয়ের পাতায়-পাতায় যা লেখা আছে, তাই জেনে নিই। অন্য লোকে পড়ে না তেমন করে, তাই জানে না। কী বক্তব্য ?"

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে একটি তিব্বতি দল তিস্তার ধারেকাছে ডাকাতদের হাতে পড়ে। ওদের সঙ্গে একটি মূল্যবান মূর্তি ছিল।

মূর্তিটি আর পাওয়া যায় না। এ-ব্যাপারে কিছু জানা থাকলে বলুন।" অর্জুন সরাসরি জানতে চাইল।

"অবলোকিতেশ্বর বৌদ্ধমূর্তি ?"

"আমি জানি না। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি নয়।"

"আশ্চর্য ! এর সঙ্গে জলপাইগুড়ির পুরাকীর্তির কী সম্পর্ক ? ঠিকঠাক প্রশ্ন করতে পারো না কেন ? হ্যাঁ। এই সেদিন সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ সালে, ওরকম একটা ডাকাতির পর হইচই হয়েছিল খুব। মূর্তিটা নাকি খুব দামি। কত দামি, তা কেউ বলতে পারেনি। ইংরেজরা বলেছিল, কয়েক হাজার পাউন্ড। যে জিনিস চোখে দেখিনি বা কোনও বিশেষজ্ঞ দ্যাখেননি তার দাম অনায়াসে বাড়িয়ে দেওয়া যায়। এরকম বুনো হাঁসের পেছনে ছুটতে আমি রাজি নই। ওরা তো মিথ্যে কথাও বলতে পারে।"

সুধীর মৈত্রের কথায় যুক্তি আছে। যা তিনি দেখেননি, যা আদৌ ছিল কিনা তার কোনও প্রমাণ নেই, সেটা সাধারণ না অসাধারণ, তা নিয়ে তিনি গবেষণা করতে রাজি নন। ঠিক কথা। কিন্তু জিনিসটি যে অসাধারণ, তা রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড অনুমান করেছিলেন বলেই এত বছর বাদে তাঁর নাতনি ভারতবর্ষে এসে হাজির হয়েছে। তারিণী সেনের হাত কেটে ফেলে অত্যাচার করেও তো ভদ্রলোক মূর্তিটাকে পাননি। সরকারি ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল, তা সত্ত্বেও বিফল হয়েছিলেন তিনি। এত বছর পরে ডরোথি কী করে বুঝল যে সে সফল হবে ? আর ডরোথি তো

এখন একা নয়। দু'-দুবার এদেশে এসে ভালই সঙ্গী জোগাড় করতে পেরেছে। তিস্তা ভবনের দিকে যেতে- যেতে এই সব ভাবছিল অর্জুন।

ডরোথি তৈরি ছিল। বলল, "আমাদের যেতে দেরি হয়ে গেল না তো ?"

অর্জুন ঘড়ি দেখল। এখন তিনটে বাজে। বলল, "না। সন্ধের মধ্যে ফিরে আসতে পারব।"

মেয়েটা সাবলীলভাবে মোটরবাইকের পেছনে উঠে বসল। ওর মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছে না যে, ওর দাদুর হয়ে ক্ষমা চাইতে নয়, স্রেফ মূর্তির লোভে এ-দেশে আছে। বেশ চমৎকার অভিনয় করতে পারে মেয়েটা। তিস্তা ব্রিজের ওপর এসে অর্জুনের ইচ্ছে করছিল ডরোথির সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল সে। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

পূর্বদহে যখন ওরা পৌঁছল তখনও মাটিতে হালকা রোদ। চার ধার ঝরঝরে। বাইক থেকে নেমেই সে দেখল ডাক্তারবাবু মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে আছেন। ওদের দেখে এগিয়ে এলেন তিনি। অর্জুন বলল, "ডরোথি আবার এল দেখা করতে। ক্ষমা চাইতে।" কথাগুলো ইচ্ছে করেই সে ইংরেজিতে বলল। ডরোথি তখন মন্দিরের পূর্ব দিকে পুকুরটার দিকে তাকিয়ে আছে। সংস্কার হয়নি অনেককাল। পানায় ঢেকে গেছে এতকালের পদ্মদিঘি।

ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়েই তারিণী সেনের বাড়িতে এল। তারিণী সেন এখনও ঘুমোচ্ছেন। ওষুধে ভাল কাজ হয়েছে। হঠাৎ ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "উনি এ-বাড়িতে কতদিন আছেন ?"

আজ দ্বিতীয়া বৃদ্ধাকে দেখতে পেল অর্জুন। ওঁর বয়স হয়েছে তবে প্রথমার মতো নয়। ডাক্তারবাবু তাঁকে প্রশ্ন করলেন

ডরোথির হয়ে। দ্বিতীয়া বললেন, "হিসেব নেই।"

"এর আগে ওঁর বাড়ি ছিল কোথায় ?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"আগে তো জঙ্গলে ঘুরত। এই বাড়িতে ওর বাপও থাকত।"

তথ্যটা ডরোথিকে জানিয়ে দিল অর্জুন।

ইতিমধ্যে প্রথমা তারিণী সেনকে ঘুম থেকে তুলে বাইরে নিয়ে এসেছেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছেন এখন ? জ্বর ছেড়েছে ?"

"ভগবান নিচ্ছে না, তাই যেতে পারছি না। এটাকে কি থাকা বলে !" গলার স্বর এখনও মিনমিনে। ডাক্তারবাবু বললেন, "আমি উঠি। পেশেন্ট আসবে। যাওয়ার সময় দয়া করে যদি আসেন— !"

অর্জুন নিঃশব্দে মাথা নাড়তে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

ডরোথি বলল, "ওঁকে বলো যে, আমি দাদুর হয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছি।"

www.boiRboi.blogspot.com

অনেক কষ্টে হাসি চেপে অর্জুন সে-কথা তারিণী সেনকে জানিয়ে দিল।

হঠাৎ তারিণী সেন নিজের হাত দুটো ডরোথির দিকে তুলে ধরলেন, "এ দুটো ফিরে পাব ?"

ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "উনি কী বলছেন ?"

অর্জুন দোভাষীর কাজ করতে লাগল। ডরোথি বলল, "এ-কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন ?"

"কারণ, তোমার দাদু আমাকে সারাজীবনের জন্যে ঠুঁটো করে গেছেন।"

"অসম্ভব ! আমি বিশ্বাস করি না।"

তারিণী সেন হাসল, "কবরে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো, উত্তর পেয়ে যাবে।"

"আপনি কী অন্যায় করেছেন, যাতে তিনি এত বড় শাস্তি দিতে বাধ্য হয়েছেন ?"

অর্জুন 'বাধ্য হয়েছেন' শব্দ দুটো শুনে মজা পেল। ডরোথি তার দাদুকে বাঁচাতে চাইছে।

তারিণী সেন বললেন, "ওই যে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম কমলাবাবুকে। নইলে মানুষটা মরেই যেত। সেই ব্যাপারটাকে অপরাধ বলে মনে করলেন গোরাসাহেব। বললেন, হাত কেটে ফেলবেন, যদি না আমি তাকে মূর্তিটা দিয়ে দিই।"

কথাটা ইংরেজিতে অনুবাদ করে ডরোথির দিকে তাকাল অর্জুন। মেয়েটার মুখে একটুও অন্য ছাপ ফুটল না। সে জিজ্ঞেস করল, "কিসের মূর্তি ?"

তারিণী বললেন, "তোমায় গোরাসাহেব বলেননি মূর্তির কথা ?"

"আমার সঙ্গে দাদুর কোনও কথা হয়নি। আমি তাঁর লেখা ডায়েরিতে যে তিনজনের নাম পেয়েছি তাঁদের মধ্যে আপনি আছেন। তাই এখানে এসেছি।"

"অ। তা হবে।" মূর্তিটা পেয়েছিলাম তিব্বতিদের কাছ থেকে। ওটার ওপর গোরাসাহেবের খুব লোভ ছিল। একটা হাত কাটার পর বলেছিল মূর্তি দিলে দ্বিতীয়টা কাটবে না। তাও যখন রাজি হলাম না, তখন এটাও কাটল।" ডান হাত দেখালেন বৃদ্ধ, "জানে মারল না। মারলে তো মূর্তি কোনওদিনই পাওয়া যাবে না !"

ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "মূর্তিটা কি খুব দামি ?"

"নাঃ। কেউ কিনতে চায়নি। ময়নাগুড়ির মাড়োয়ারি দোকানদার আট আনা দাম দিয়েছিল।"

"আমার দাদু আপনাকে টাকা দিতে চাননি ?"

"হ্যাঁ। একশো টাকা।" চোখ বড় করলেন তারিণী সেন। পঞ্চাশ বছর আগে একশো টাকার দাম ছিল কয়েক হাজার টাকার সমান।

"দিলেন না কেন ?"

"দিলেই তো আমাকে খতম করে দিত গোরাসাহেব। মূর্তিটার লোভে আমাকে জেল থেকে বাঁচিয়েছে। আমাকে মেরে ফেলতে পারেনি।" তারিণী সেন ফিকফিক হরে হাসতে লাগলেন।

"মূর্তিটার শেষপর্যন্ত কী হল ?"

"কালোর মধ্যে লাল আর লালের মধ্যে কালো/ভক্তিভরে তারে নমো করাই ভাল।"

"এর মানে কী ?"

তারিণী সেন এর জবাব দিলেন না। একই ভাবে হাসতে লাগলেন।

www.boiRboi.blogspot.com

"কত টাকা দিলে মূর্তিটা আপনি দিতে পারবেন ?"

"কেন ? মূর্তিটা তুমি কেন চাইছ ?"

"আমার দাদুর ইচ্ছে ছিল, ওটা নিজের কাছে রাখার। সেই ইচ্ছে পূর্ণ করতে চাই।"

তারিণী সেন হাসলেন, "তা হলে ক্ষমা চাইতে নয়, মূর্তির জন্যে এসেছ আমার কাছে ?"

এই গোপন সত্যটা মুখের ওপর বলে দিলেন বৃদ্ধ। অনুবাদ করতে-করতে নিজেকে ঠিক রাখা বেশ মুশকিল হচ্ছিল অর্জুনের। ডরোথি হঠাৎ গলার স্বর পালটাল, "কত টাকা পেলে মূর্তিটা দিতে পারবেন ? দশ হাজার টাকা ?"

তারিণী সেন অঙ্কটা শুনে যেন অবাক হয়ে গেলেন ! কোনও কথা বলতে পারলেন না।

ডরোথি আবার প্রশ্ন করল, "ঠিক আছে, আপনাকে কুড়ি হাজার

টাকা দেব আমি।”

এবার দ্বিতীয় বৃদ্ধা চিৎকার করে উঠলেন, “কথা বলছেন না কেন ? কুড়ি হাজার টাকা। ওমা, আর ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।”

তারিণী সেন তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর দিকে তাকালেন। টাকার অঙ্কটাকে বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ভদ্রলোক। অর্জুনের ভয় হচ্ছিল, উনি রাজি হয়ে যাবেন। সে চটপট বলে উঠল, “ডরোথি, তুমি ভুল করছ। ভারত সরকারের অনুমতি ছাড়া এ-দেশ থেকে কোনও মূর্তি তুমি নিয়ে যেতে পারবে না। আর মূর্তির যদি পুরাতাত্ত্বিক মূল্য থাকে, তা হলে কখনওই সেই অনুমতি পেতে পারো না।”

ডরোথি শক্ত গলায় জবাব দিল, “কীভাবে নিয়ে যাব সেটা আমার চিন্তা। ওঁকে তুমি জিজ্ঞেস করো মূর্তিটা ওই টাকায় দেবেন কি না!”

www.boiRboi.blogspot.com

অর্জুন এবার মিথ্যাচার করল, “আপনি যেটা ওর দাদুকে দেননি তা কি এখন মাত্র কুড়ি হাজার টাকায় দিয়ে দেবেন ?”

“মাত্র ? কুড়ি হাজার মাত্র নাকি ? মাড়োয়ারি দোকানদার আট আনাও দাম দেয়নি।”

অর্জুন কথাগুলো অনুবাদ করল না। সে বলল, “ডরোথি, উনি বলছেন সে সময় ওই মূর্তির দাম ছিল তোমাদের টাকায় এক হাজার পাউন্ড।”

“এ-কথা উনি জানলেন কী করে ?”

অর্জুন তারিণী সেনের দিকে তাকিয়ে বলল, “তখন একশো টাকার লোভ ছেড়েছিলেন প্রাণের ভয়ে। এখন তো সেই ভয় নেই!”

তারিণী সেন এবার নীরবে মাথা নাড়লেন। সেটা দেখিয়ে

অর্জুন বলল, “উনি রাজি হচ্ছেন না। সেই সময় হাজার পাউন্ড দাম উঠলে এখন তো কোটি টাকা হবে ডরোথি। তুমি মাত্র কুড়ি হাজার টাকায় সেটা পাওয়ার আশা করতে পারো না।”

“এটা ওঁর কথা, না তুমি আমাকে বলছ ?”

“আমিই বলছি।”

“দ্যাখো অর্জুন, আমি আশা করছি তুমি আমাকে সহযোগিতা করবে। ওই মূর্তির জন্যে আমি অনেক খরচ করেছি। তুমি ভেবো না আমি তোমাকে বঞ্চিত করব। তুমি তোমার কমিশন পাবে। এখন ওঁকে বলো পঁচিশ হাজার টাকা আমি দেব। এরকম ভিখিরির মতো অবস্থায় পঁচিশ হাজার পেলে এরা বর্তে যাবেন।”

দ্বিতীয়া জিজ্ঞেস করলেন, “কী বলছে ?”

অর্জুন জবাব দিল, “পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে পারে।”

দ্বিতীয়া স্বামীকে বললেন, “অনেক কষ্ট করেছি। আর না। কোথায় রেখেছেন ওই মূর্তিটাকে ? আপনি আমাকে কখনও বলেননি, দিদিকে বলেছেন ?”

পেছনে দাঁড়ানো প্রথমা মাথা নেড়ে না বললেন নীরবে।

দ্বিতীয়া এখন রুখে দাঁড়িয়েছেন, “তা হলে দেখুন কী রকম মানুষ আপনি! এই বয়সেও গতর খাটিয়ে খাচ্ছি আর আপনি গুপ্তধন মাটিতে পুঁতে বসে আছেন। ফট করে মরে গেলে আমরা জানতেই পারব না ওটার কথা। আমাদের একটু ভালো থাকতে আপনি দেবেন না ?”

বৃদ্ধ মাথা নিচু করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “কালোর মধ্যে লাল আর লালের মধ্যে কালো/ভক্তিভরে তারে নমো করাই ভাল। চিতায় পা দিয়ে বসে আছি, এখন টাকা নিয়ে কী করব ? অ্যাঁ ?”

অর্জুন কথাটা অনুবাদ করে ডরোথিকে শোনাতেই ডরোথি ব্যাগ

খুলে কয়েকটা একশো টাকার নোট বের করে দ্বিতীয়া বৃদ্ধার কাছে এগিয়ে গেল, "প্লিজ, ওকে রাজি করাও।"

দ্বিতীয় বৃদ্ধা ইংরেজি বুঝতে না পারলেও বেশ অনুমান করলেন ডরোথি কী বলতে চাইছে! কাঁপা হাতে টাকাগুলো নিয়ে তিনি স্বামীর কাছে ছুটে গেলেন, "এই দ্যাখো টাকা, আগাম দিয়েছে। বলো, কোথায় রেখেছ মূর্তিটাকে?"

তারিণী সেন মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, "ভুলে গেছি।"

"মিথ্যে কথা! তুমি ভুলে যাওয়ার লোক নও। ওই হেঁয়ালিটা প্রায়ই শোনাও। তোমাকে বলতেই হবে কোথায় রেখেছ।"

"বললাম তো, ভুলে গেছি।"

"আবার মিথ্যে কথা! রাজ্যের গল্প তোমার মনে আছে আর এটা ভুলে গেছ?"

অর্জুন উঠল। সে দেখল ইতিমধ্যে উঠোনে ভিড় জমে গেছে। গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। তারিণী সেনের কাছে একটা মূর্তি আছে যার দাম অনেক। পঁচিশ হাজার দাম দিচ্ছে মেমসাহেব। এত টাকা পাওয়া যেতে পারে, এই গ্রামের মানুষ ভাবতেই পারে না! তারিণী সেনের সৌভাগ্যে তাদের মনে ঈর্ষা বাড়ছে। অর্জুন বলল, "আপনি চিন্তা করে দেখুন। আমরা নাহয় কাল আসব।"

তারিণী সেন মাথা নাড়লেন নিঃশব্দে। অর্জুনের মনে হচ্ছিল, বৃদ্ধ পুরো ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছেন। কিন্তু ওঁর ওপর যে অর্থনৈতিক চাপ, তাতে এখন মূর্তির হদিশ বলে না দেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। ওরা মন্দিরের সামনে ফিরে এল। ইতিমধ্যে জনতার আকার বেড়ে গেছে। একজন এগিয়ে এসে বলল, "আমার কাছে ছোট-ছোট কিছু মূর্তি আছে। কিনবেন?"

ডরোথি জানতে চাইলে অর্জুন অনুবাদ করে শুনিয়ে দিল।

www.boiRboi.blogspot.com

"কী ধরনের মূর্তি ?"

"পাথরের। আসুন না !"

অর্জুন তাকে বোঝাল, "না ভাই। উনি বিশেষ একটা মূর্তির জন্যে এসেছেন, যে-কোনও মূর্তি কেনার বাসনা ওঁর নেই।" কিন্তু লোকটি নাছোড়বান্দা। মূর্তি সে দেখাবেই। অর্জুনরা যাচ্ছে না দেখে সে একজনকে দিয়ে বাড়ি থেকে আনিয়ে নিল মূর্তিটা। অর্জুন দেখল চার ইঞ্চিটাক একটি মানুষের অবয়ব পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। ডরোথি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে বলল, "এর জন্যে আমি বড়জোর পঞ্চাশ টাকা দিতে পারি।"

লোকটি ছোঁ মেরে ফিরিয়ে নিল, "মামার বাড়ি ! না দেখা মূর্তির জন্যে পঁচিশ হাজার, আর আমার জিনিস দেখে মাত্র পঞ্চাশ ?"

ডরোথি কিনবে না, আর লোকটি বিক্রি করবেই। এই সময় ডাক্তারবাবু এসে উদ্ধার করলেন ওদের। একটু ফাঁকায় সরিয়ে নিয়ে বললেন, "কী শুনছি মশাই ! পঁচিশ হাজার...।"

"ঠিকই শুনেছেন। তারিণীবাবুর মাথা এখনও ঠিক কী করে আছে জানি না !"

"দিয়ে দিক। বাকি ক'টা দিন খেয়ে-পরে বাঁচবে তা হলে !"

"আপনি এ-কথা বলছেন ?"

"দেখুন, আমরা বাধা দিলে ওঁর তো কোনও উপকার হবে না ! মূর্তি উদ্ধার হলে সরকার নিয়ে নেবে। হয়তো একটা নামমাত্র মূল্য দিতে পারে। তাও সেই টাকা উনি জীবিত অবস্থায় পাবেন কি না সন্দেহ। তার চেয়ে দিয়েই দিক।"

"কিন্তু আমাদের দেশের কোনও অমূল্য সম্পদ বিদেশে চলে যাবে ?"

"এখন যে ওটা দেশে আছে তা আপনি কি জানেন ? এতকাল

যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে সেখানেই তো চিরকাল থেকে যেতে পারত, ওই মেমসাহেব না এলে !"

অর্জুন মন্দিরটার দিকে তাকাল। ডাক্তারবাবু যা বলছেন তাতে নিশ্চয়ই যুক্তি আছে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটার মধ্যে একটা লুকোচুরি আছে। এইটে কিছুতেই মেনে নেওয়া যেতে পারে না। অর্জুন অন্যমনস্ক হয়ে মন্দিরটাকে দেখছিল। ডাক্তারবাবু এখন ডরোথির সঙ্গে কথা বলছেন। বিকেল ঘন হয়ে এসেছে। পদ্মদিঘির পানায় এখন ঘন ছায়া। চোখ তুলতেই লাল মন্দিরটা নজরে এল। ছোটখাটো মন্দির। সে ধীরে-ধীরে মন্দিরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেই গাইড হতে-চাওয়া লোকটি এসে বলল, "এখন এই লাল মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ আছে। বেশিদিনের পুরনো না।"

"মন্দিরটার রং লাল কেন ?"

www.boiRboi.blogspot.com

"জানি না বাবু। এটার কথা কেউ ভাবে না। আমাদের বড় মন্দিরই আসল মন্দির।"

অর্জুন উঁকি মেরে শিবলিঙ্গ দেখতে পেল। কালো পাথরের গায়ে কেউ সাদা দাগ এঁকে রেখেছে মাহাত্ম্য বাড়াতে। সে জিজ্ঞেস করল, "এখানে পুজো হয় না ?"

"জল-বেলপাতা পড়ে। তবে শিবরাত্রির দিন ঘটা করে হয়।"

সন্ধে হয়ে আসছিল। অর্জুন ডরোথিকে নিয়ে বাইকে উঠল। মিনিট কুড়ির মধ্যে ওরা তিস্তা ব্রিজে পৌঁছে গেল। চমৎকার সূর্যাস্ত হয়ে চলেছে তিস্তার বুকে। বাইক থামিয়ে ওরা রেলিংয়ের ধারে চলে এল। তিস্তায় এখন শীর্ণ জলের ধারা। আকাশে নানা রঙের মাখামাখি চলছে।

হঠাৎ ডরোথি বলল, "আমি খুব দুঃখিত, কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে না বলে উপায় ছিল না !"

অর্জুন হাসল, কিন্তু কিছু বলল না।

ডরোথি বলল, "আমি মূর্তি নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছি এটা তোমাদের সরকার মেনে নেবে না তা এর আগের বার দিল্লিতে এসে জেনেছিলাম। অতএব এই কথাটা আমি প্রকাশ্যে বলতে পারব না। তোমাকেও বলিনি।"

"মূর্তিটার কথা তোমার দাদু ডায়েরিতে লিখেছিলেন ?"

"হ্যাঁ। তারিণী সেন ছাড়া ওই দু'জন বিপ্লবীর নামও ছিল ডায়েরিতে। দাদুর ধারণা ছিল তারিণী সেনের সঙ্গে কমলাকান্ত রায়ের যোগাযোগ আছে। মূর্তিটা কমলাকান্ত রায়কে লোকটা দিয়ে দিতে পারে। পরে বুঝেছিলাম, ভাবনাটা ভুল।"

"ভুল কেন ?"

"ওঁর কাছে খবর এসেছিল কমলকান্ত রায় মূর্তিটার কথা জানেনই না।"

"বেশ। এ-দেশে একটি মূর্তির কথা তোমার দাদু জেনেছিলেন। মূর্তিটা তাঁরও নয়। তবু এত বছর পরে সেটা পাওয়ার জন্যে তুমি মরিয়া হলে কেন ?"

"আমি বাধ্য হয়েছি।"

"তার মানে ?"

"আট মাস আগে আমার বাড়িতে হামলা হয়েছিল। আমরা তখন বাড়িতে ছিলাম না। ফিরে এসে দেখি সমস্ত জিনিসপত্র তছনছ করে কিছু খোঁজা হয়েছে। পুলিশকে জানিয়েছিলাম। তারাও কোনও হদিশ করতে পারল না। এর পর ফোন পেলাম। তখনই জানলাম মূর্তিটার কথা। তার আগে আমি কখনও দাদুর ডায়েরি পড়িনি, ইচ্ছেও হয়নি।"

"কার ফোন পেয়েছিলে ?"

"লোকটা তিব্বতি। যে তিব্বতিদের ওপর তারিণী সেন

ডাকাতি করেছিল, ও তাদের বংশধর। শুধু ও না, তিব্বতীদের একটা সংগঠন ওই মূর্তি ফেরত চায়। ওদের ধারণা, আমার দাদু ওটা ইংল্যান্ডে নিয়ে এসেছেন। আমি ব্যাপারটা জানি না বললে ওরা বিশ্বাস করেনি। আমার ওপর সমানে চাপ দিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের কাছে গেলে ওরা আরও মারাত্মক হতে পারে। শেষ পর্যন্ত ওরা আমার বাড়িতে আসা-যাওয়া আরম্ভ করল। আমি ওদের দাদুর লেখা ডায়েরি দেখালাম। ওরা সেই সময়ের একটা খবরের কাগজ এনে আমাকে দেখাল, যাতে দাদুর ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছে। দাদু বলেছেন এক হাজার পাউন্ড পেলে মূর্তিটা তিনি বিক্রি করতে রাজি আছেন। কাগজটি অবাক হয়ে লিখেছিল, মিস্টার রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড কী এমন জিনিসের মালিক হয়েছেন জানা নেই, তবে এক হাজার পাউন্ড মূল্য জিনিসটিকে আরও মূল্যবান করে দিয়েছে। তিব্বতিরা বলল, "ওই কাগজের ইন্টারভিউ প্রমাণ করছে দাদু মূর্তিটা পেয়ে গিয়েছিলেন। আমি ফাঁপরে পড়ি। আমার পূর্বপুরুষের দায় মেটানো ছাড়া কোনও উপায় নেই। গত বার দিল্লিতে এসে খোঁজখবর নিলাম। ওদের একজন লোক আমাকে সাহায্য করল। ওরা চাইছে আমি সব করি, কারণ মূর্তিটা যে আমার কাছে নেই, সেটা আমাকেই প্রমাণ করতে হবে।"

"তার মানে তারিণী সেন মূর্তিটা দিয়ে দিলে তুমি তিব্বতিদের সেটা ফিরিয়ে দেবে ?"

"হ্যাঁ। ঠিক তাই।"

"গতরাত্রে তুমি যাদের সঙ্গে গ্রামে যেতে চেয়েছিলে, তারা কে ?"

ডরোথি একটু অবাক হল ! কিন্তু সেটা সহজেই কাটিয়ে উঠে বলল, "ওদের একজনের বাবা তিব্বতি মা ব্রিটিশ। আর-একজন

www.boiRboi.blogspot.com

বাঙালি। বাঙালি লোকটি শিলিগুড়িতে থাকে, আর প্রথমজন আমার সঙ্গে এসেছে। এয়ারপোর্টে তুমি বুঝতে পারোনি।"

"অমল সোমের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল?"

"হ্যাঁ। ওই তিব্বতিরাই আলাপ করিয়ে দেয়। একজন বিদেশির পক্ষে এত বছর পরে তারিণী সেনকে খুঁজে বের করা মুশকিল! আমরা পুলিশকেও জানাতে চাইনি। এই শহরে তুমি প্রাইভেট গোয়েন্দাগিরি করো। তোমাকে মিস্টার সোম অনুরোধ করলে তুমি কিছুতেই না বলবে না, এটা ওরা জেনেছিল।"

"অর্থাৎ আমার সব কিছুই তুমি জানো?"

"কিছুটা। তাই তোমার সঙ্গে অভিনয় করতে হচ্ছে।"

"এখন তো তারিণী সেনকে পেয়ে গেছ। তিব্বতিদের বলছ না কেন ওর কাছে গিয়ে মূর্তিটা নিয়ে নিতে। তারিণী সেন তো স্বীকার করেছে ওর কাছেই আছে।"

"ওরা তাই করবে। কিন্তু আমি চাইনি, ওরা তারিণী সেনের ওপর অত্যাচার করুক। মানুষটি কী গরিব! আমার দাদু ওর ওপর যে অত্যাচার করেছেন, তা নিজের চোখেই দেখেছি। আমার মনে হয়েছে অন্তত পঁচিশ হাজার টাকা দিলে ও যদি ভালভাবে থাকে তাহলে দাদুর পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি।"

"মূর্তিটার জন্যে তিব্বতীরা এত বছর পরে সক্রিয় হল কেন?"

"ওরা নাকি দীর্ঘদিন ধরে সন্ধান চালিয়েছে। ওই মূর্তি ওদের সৌভাগ্যের প্রতীক। শেষ পর্যন্ত ওরা আমার দাদুর দেওয়া ইন্টারভিউ পড়ে আমার কাছে আসে।"

অর্জুন চুপচাপ শুনল। ডরোথির কথা বিশ্বাস করবে কিনা সেটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। সে চুপচাপ বাইক চালিয়ে ডরোথিকে তিস্তা ভবনে পৌঁছে দিল। বাইক থেকে নেমে ডরোথি জিজ্ঞেস করল, "তুমি কিছু বললে না?"

"না। আমার মনে হয় তুমি আগামীকাল বন্ধুদের সঙ্গে ফিরে যেতে পারো। সেক্ষেত্রে আমার সাহায্য আর দরকার হবে না। আজ রাত্রেই তো তোমার বন্ধুরা জেনে যাবে, তারিণী সেনের কাছে মূর্তিটা আছে। কিন্তু লোকটার যদি কোনও ক্ষতি হয়, তা হলে আমি চুপ করে বসে থাকব না।" ডরোথি কোনও জবাব দিল না। অর্জুন ওকে চুপচাপ দাঁড় করিয়ে রেখে বাইকে স্পিড তুলল।

থানায় পৌঁছে দেখল অবনীবাবু জিপে উঠতে যাচ্ছেন। ওকে দেখে বললেন, "ফিরে এলেন? ঠিক বিকেলবেলায় মিনিস্টার এসে হাজির। ইচ্ছে থাকলেও বেরোতে পারলাম না!"

"মিনিস্টার আছেন না গেছেন?"

"আছেন। সার্কিট হাউসে। কিন্তু এখন আমি ফ্রি।"

www.boiRboi.blogspot.com

"আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

ভেতরে ঢুকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল অর্জুন। ভদ্রলোক বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, "অসম্ভব! জিনিসটা যে তিব্বতিদের, তা ওদের প্রমাণ দিতে হবে। দেশের আইন মেনে ওদের আবেদন করতে হবে, যদি ওটা ধর্মীয় মূর্তি হয়। এভাবে নিয়ে যেতে পারে না এবং দেব না।"

"দেবেন না ঠিক, কিন্তু আপনার কাছে থাকলে তো ওই প্রশ্ন উঠছে।"

"তারিণী সেন তা পঁচিশ হাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে?"

"এখনও রাজি হয়নি।"

"তা হলে ওঁকে গিয়ে বলা যাক মূর্তিটার হদিশ দিতে।"

"যে-মানুষ টাকার বিনিময়ে খবর দেয়নি, সে পুলিশের ধমকে দেবে—এটা বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।"

"আশ্চর্য ! আরে, হাজার হোক জিনিসটা তো ডাকাতি করে পাওয়া। ডাকাতির জিনিস তো ইল্‌লিগ্যাল জিনিস। সেটা লুকিয়ে রাখা তো অবৈধ ব্যাপার। এটা বুঝিয়ে বলব।"

"পঞ্চাশ বছর লুকিয়ে রাখলে সেটা আর অবৈধ কতখানি থাকে তা জানি না। এদেশ থেকে কয়েক শো বছর আগে হিরে-মানিক ডাকাতি করে বিদেশিরা নিয়ে গিয়েছিল। তার একটাও ফেরত পেয়েছি কি আমরা ? ওভাবে হবে না। আমার খুব ভয় হচ্ছে তারিণী সেন রাজি না হলে ওরা ওঁর ওপর অত্যাচার করবেই। এত দূরে যারা এত বছর পরে আসতে পারে, তারা কিছুতেই হার মানবে না। ওঁকে প্রোটেক্ট করা উচিত।"

"ঠিক আছে, আমি ময়নাগুড়ি থানাকে অনুরোধ করছি যাতে ওঁর বাড়ির সামনে পুলিশ পাহারা দেয়। এস.পি সাহেবের সঙ্গেও কথা বলতে হবে।" অবনীবাবু ফোন তুললেন।

www.boiRboi.blogspot.com

সত্যি, এখন কিছু করার নেই। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে ভাবছিল অর্জুন। বৃদ্ধ তারিণী সেনের ইচ্ছের ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। তিনি যদি ওদের দিতে চান, তা হলে পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারে। মূর্তিসমেত ওদের ধরে ফেললে বিচারের ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু যদি না দেন, তা হলে হাজার চাপ দিয়েও পুলিশ বৃদ্ধের কাছ থেকে খবর বের করতে পারবে না।

আজ রাত্রে তিব্বতি ভদ্রলোক ডরোথির কাছে সব শুনবে। ওরা মূর্তির জন্য এসেছে, তা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ওরা আরও সতর্ক

হবে। ওরা নিশ্চয়ই জানে, পুলিশ ওদের কাছে মূর্তি পেলে ছাড়বে না। মূর্তি না পাওয়া পর্যন্ত ওদের কিছু করার ক্ষমতা পুলিশের নেই। এক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওরা মূর্তি নিয়ে সরে পড়তে চাইবে। এবং সেটা আজ রাত্রেই।

ময়নাগুড়ি থানা থেকে পুলিশ নিশ্চয়ই এর মধ্যে পূর্বদহে পৌঁছে গিয়েছে। পুলিশ থাকতে ওরা কী করে তারিণী সেনের কাছে পৌঁছবে ? অর্জুন ভেবে পাচ্ছিল না। এই সময় মা ঘরে ঢুকলেন, "কিরে ঘুমোসনি ? সারাদিন কোথায় টো-টো করে ঘুরিস ?"

অর্জুন উঠে বসল, "আচ্ছা মা, একটা ধাঁধা শোনো। কালোর মধ্যে লাল আর লালের মধ্যে কালো/ ভক্তিভরে তারে নমো করাই ভালো। মানে কিছু বুঝলে ?"

মা একটু ভাবলেন, "এ কী রকম দেবতা রে ?"

"দেবতা বলে মনে হচ্ছে ?"

"হ্যাঁ। নমো করার কথা বলছে তো। নমো করা ভালো। তার মানে কেউ-কেউ নমো করে না তাই করতে বলছে।"

"কেউ-কেউ করে না, তাই করতে বলছে ?" অর্জুন লাফিয়ে উঠল। মাকে জড়িয়ে ধরে সে চেঁচাল, "ইউরেকা ! পেয়ে গেছি !" আর তখনই টেলিফোন বাজল।

দৌড়ে গিয়ে রিসিভার তুলল অর্জুন, "হ্যালো !"

"এত রাত্রে বিরক্ত করলাম। দুঃখিত।" অবনীবাবুর গলা, "একটা খারাপ খবর আছে।"

"বলুন।"

"তারিণী সেন হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

"আপনি কোত্থেকে খবর পেলেন ?"

"এইমাত্র ময়নাগুড়ির পুলিশ জানাল। ওরা গ্রামে যাওয়ার পর ঘটনাটা ঘটে।"

"কোন হাসপাতালে আছেন ?"

"সম্ভবত ময়নাগুড়ির হাসপাতালে।"

"খোঁজ নিন। হাসপাতালে যেন পাহারা থাকে।"

"আমি এস পি সাহেবকে বলেছি। উনিও ময়নাগুড়িকে নির্দেশ দিয়েছেন।"

"ভাল। অবনীবাবু, আমি এখনই বের হচ্ছি। আপনি যাবেন ?"

একটু দ্বিধা করলেন অবনীবাবু। তারপর বললেন, "চলুন।"

ময়নাগুড়ির হাসপাতালে ওরা যখন পৌঁছল, তখন রাত বারোটা। অবনীবাবুর জিপেই এসেছে অর্জুন। হাসপাতালে পৌঁছে ওরা অবাক ! তারিণী সেনকে ওই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়নি। সঙ্গে-সঙ্গে থানায় যাওয়া হল। ও সি ছিলেন না। একজন এস আই বললেন, সন্ধের পর যে দু'জন পুলিশকে পূর্বদহে পাঠানো হয়েছিল, তারাই ফিরে এসে খবর দিয়েছে ওঁর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কথা। সেই পুলিশ কনস্টেবলদের সঙ্গে কথা বলতে চাইল অর্জুন। দু'জনেই থানায় ছিলেন। প্রশ্নের জবাবে তাঁরা বললেন, হুচলুডাঙা থেকে পূর্বদহে যাওয়ার পথে ওঁরা একটা গাড়ি দেখতে পান। কৌতূহলবশে গাড়িটি থামাতেই কয়েকজন মানুষ বলে ওঠে, পেশেন্ট আছে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। গাড়িতে একজন বৃদ্ধের পাশে মহিলাও ছিলেন। তারপর তাঁরা পূর্বদহে পৌঁছে শুনতে পান, তারিণী সেন বিকেলবেলায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তার তাঁকে ইঞ্জেকশন দেন। কিন্তু অবস্থা খারাপ হতে থাকে। এই সময় একটা গাড়ি হঠাৎই গ্রামে আসে। সেই গাড়িতে করে ওঁকে

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

অর্জুন গম্ভীরমুখে বলল, "দোষ আমার। গাড়িটা কি কালো অ্যাম্বাসাডার ?"

"হ্যাঁ সার।"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল। অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "জলপাইগুড়ির হাসপাতালে খবর নেব ?"

"নিন। কিন্তু লাভ হবে বলে মনে হয় না।"

টেলিফোনে যোগাযোগ করা হল। থানার টেলিফোন বলে লাইন পেতে অপেক্ষা করতে হল না। জলপাইগুড়ির হাসপাতাল জানাল, তারিণী সেন নামের কোনও বৃদ্ধকে আজ বিকেলের পর ওখানে ভর্তি করা হয়নি। অর্জুন বলল, "চটপট পূর্বদহে চলুন। দেরি করলে দু'-কূলই যাবে।"

জিপে উঠতে-উঠতে অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "দু'-কূলই মানে ?"

"তারিণী সেনের জীবন এবং মূর্তি।"

পূর্বদহে তখন কোনও প্রাণী জেগে নেই। এমন কি গ্রামের কুকুরগুলোও গলা খুলছে না। অর্জুন সোজা ডাক্তারবাবুর দরজায় হাজির হল মন্দিরের সামনে গাড়ি রেখে। খানিকটা ডাকাডাকির পর ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন ঘুম-চোখে। অর্জুন অবনীবাবুর পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমি চলে যাওয়ার পর তারিণীবাবুর কী হয়েছিল ?"

"উত্তেজনা। আর তা থেকে বুকে ব্যথা শুরু হয়ে গিয়েছিল। হার্ট অ্যাটাক বলব না, তবে যে কোনও মুহূর্তে হতে পারত। হয়নি যে তা বলব না, কারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর আমি কোনও খবর পাইনি।" ভদ্রলোক ধাতস্থ হচ্ছিলেন।

"আপনি ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন ?"

www.boiRboi.blogspot.com

"হ্যাঁ।"

"যারা ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেল তাদের আপনি চিনতেন?"

"ওই যারা সকালে এসে টাকা দিয়ে গিয়েছিল, তারাই ফিরে এসেছিল।"

"আপনি জানতেন ওরা কী উদ্দেশ্যে আসা-যাওয়া করছে। জানতেন না?"

ডাক্তার বললেন, "দেখুন মশাই, আমি চাইব পেশেন্টের প্রাণ বাঁচুক। ওরা হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইল, তখন দ্বিতীয় কোনও উপায় নেই এই গ্রাম থেকে বৃদ্ধ মানুষটাকে নিয়ে যাওয়ার, মনে হয়েছিল ভগবানই ওদের পাঠিয়েছেন। তা ছাড়া আমি তারিণীবাবুর গার্জেন নই যে, ঠিক করব কার সঙ্গে যাবে বা না যাবে। মৃত্যুপথযাত্রীর কোনও পছন্দ থাকে না।"

"ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি।"

"সে কী!"

"অন্তত ময়নাগুড়ি বা জলপাইগুড়ির হাসপাতালে ওরা যায়নি। দ্রুত চিকিৎসার জন্যে এ-দুটো জায়গায় নিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। সঙ্গে কে গেছেন?"

"ওঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী।"

"প্রথমজন কোথায়?"

"বোধ হয় বাড়িতেই আছেন।"

অর্জুন ওঁদের নিয়ে মন্দিরের সামনে এসে চারপাশে তাকাল। তারপর অবনীবাবুকে বলল, "আপনি জিপটাকে এমনভাবে সরিয়ে রাখুন যাতে এখানে এসে কেউ দেখতে না পায়।"

"কেন?"

"যারা তারিণী সেনকে নিয়ে গেছে তাদের মনে হচ্ছে, আজই

আবার এখানে আসতে হবে।"

অবনীবাবু যখন জিপটাকে আড়ালে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন অর্জুন ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ওরা কেন ফিরে এসেছিল সে-ব্যাপারে কিছু বলেছে?"

"হ্যাঁ। শিলিগুড়িতে ফিরে যাওয়ার আগে ওরা দেখে নিতে চায় উনি কেমন আছেন? আমরা তখন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। এখন... আচ্ছা, শিলিগুড়িতে নিয়ে যায়নি তো?"

"জানি না। ওরা তাই বলেছে?"

"না। শুধু জিজ্ঞেস করেছিল যে দোমহনিতে যাওয়ার কোনও শর্টকাট রাস্তা আছে কি না।"

অর্জুন অবাক হল, "দোমহনি?"

"হ্যাঁ।"

তা হলে কি ভুল হল! রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড প্রায়ই তিস্তা পেরিয়ে দোমহনিতে আসতেন। কমলাকান্ত রায়কে ওখানেই অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছিল। ওখান থেকেই তারিণী সেন তাঁকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন বার্নিশে। তারিণী সেনের হাতকাটা হয়েছিল দোমহনির লালকুঠিতে। সেখানকার খোঁজ নিয়েছে যখন, তখন...। অর্জুন বুঝতে পারছিল না। লালকুঠির রং নিশ্চয়ই লাল। ওই হেঁয়ালির ছড়া কি সেই লালকুঠিকে কেন্দ্র করে? ওখানেই কি মূর্তিটা রাখা আছে? এ কি সম্ভব হবে! তারিণী সেনের মতো মানুষ, যিনি ভাল করে হাঁটতে পারেন না, তিনি কাছাকাছি না রেখে অত দূরে লুকিয়ে রাখবেন? সে ধীরে-ধীরে লাল মন্দিরটার দিকে এগিয়ে যেতে অবনীবাবু তার সঙ্গ নিলেন। এখন আকাশে হাজার তারার ফিকে আলো। পৃথিবীতে অন্ধকার থাকলেও সেই আলোয় খানিকটা দৃষ্টি যায়। ছোট মন্দিরটাকে ঘুরে দেখল অর্জুন। কালোর মধ্যে লাল আর লালের

www.boiRboi.blogspot.com

মধ্যে কালো/ ভক্তিভরে তারে নমো করাই ভালো। লালের মধ্যে কালো দেখা যাচ্ছে, লাল মন্দিরের ভেতরে কালো শিবলিঙ্গ। কিন্তু কালোর মধ্যে লাল কোথায়? অবনীবাবু টর্চ জ্বেলে চারপাশে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী খুঁজছেন?"

"ছড়াটা মনে আছে? কালোর মধ্যে লাল...?"

"হ্যাঁ। কিন্তু এখানে কালো কোথায়?"

"কিন্তু লালের মধ্যে কালো আছে। ওই শিবলিঙ্গ। টর্চটা দিন তো।" সে জুতো খুলে মন্দিরে ঢুকল। দেওয়ালে আলো ফেলতেই দেখতে পেল ঠিক মাঝখান-বরাবর একটা মোটা কালো দাগ চারপাশে আঁকা রয়েছে। এরকম দৃশ্য অভিনব। ভেতরে একমাত্র শিবলিঙ্গ ছাড়া আর কিছু নেই। সে লিঙ্গের সামনে হাঁটু মুড়ে বসল। কিছু শুকনো ফুলপাতা ছড়ানো রয়েছে। সেগুলোকে সরিয়ে মূর্তির পূর্ণ অবয়ব দেখল। মন্দিরের মেঝে ভেদ করে যেন উঠে এসেছে। অন্তত দশ ইঞ্চি মোটা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলতে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল অর্জুন। কালো শিবলিঙ্গের ঠিক নিচের দিকটায় যেন জোড়ের দাগ। জায়গাটায় রঙ করে দেওয়া হয়েছিল কী!' সে একটা শক্ত কাঠি তুলে ঘষতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সেখানে জোড়ের দাগ স্পষ্ট হল। এই ব্যাপারটা হয়তো অধার্মিক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাবা বিশ্বনাথ নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।"

এই সময় ডাক্তারবাবুর গলা কানে এল, "এটা আপনি কী করছেন?"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল। দেবমূর্তিকে নষ্ট করার কোনও বাসনা তার নেই। তবু...। সে জিজ্ঞেস করল, "এই শিবলিঙ্গ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?"

"আমার জন্মের আগে।"

অর্জুন ধীরে-ধীরে বেরিয়ে এল বাইরে, গ্রামের মানুষ মন্দিরটাকে গুরুত্ব দেয়?"

"শিবরাত্রির দিন অবশ্যই দেয়।"

"শিবরাত্রির দিন বটগাছের তলায় পড়ে-থাকা পাথরও তো গুরুত্ব পায়।"

"আপনি কী বলতে চাইছেন?"

"শিবলিঙ্গের নিচের দিকে একটা জোড় দেখতে পেলাম। তার মানে ওখানে কোনও মেরামতি হয়েছে। মন্দিরের বাইরের রঙ লাল, ভেতরে কালো দাগ, কালো দাগের মধ্যে আবার কালো শিবলিঙ্গ, এমন তো হতে পারে তারিণী সেন ছড়া মেলাতে ইচ্ছে করে শব্দ দুটো উলটে দিয়েছেন। লালের মধ্যে কালো না বলে কালোর মধ্যে লাল বলেছেন। শিবলিঙ্গের যেখানটা মেরামতি হয়েছে সেখানে অল্প লাল রং মাখানো আছে। তা হলে অবশ্য কালোর মধ্যে লাল বলতে আপত্তি নেই।" অর্জুন জোরে-জোরেই কথাগুলো উচ্চারণ করছিল। তারপর সে অবনীবাবুকে বলল, "এই মন্দিরটাকে পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা পুরাতত্ত্ব বিভাগকে জানাব। যা ব্যবস্থা করার, তারাই করবে।"

www.boiRboi.blogspot.com

অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে মূর্তিটাকে ওখানেই লুকনো আছে?"

"আমি যদি নিঃসন্দেহ হতাম, তা হলে তো এখনই খুঁড়ে ফেলতাম। আপনি এক কাজ করুন। জিপ নিয়ে ময়নাগুড়ি চলে যান। ওখানে ফোর্স পাবেন। আজই দোমহনির লালকুঠিতে তল্লাশি চালান। মনে হয়, তারিণী সেনকে ওখানে পেয়ে যাবেন।"

"আপনি যাবেন না?"

"আমি এখানে পাহারায় থাকতে চাই, যতক্ষণ না সকাল হয়।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "আপনি আমার ওপর ভরসা করতে পারেন। এটা আমার গ্রামের মন্দির। আমি এখনই লোকজনকে ডাকছি... ।"

"না। লোকজন ডাকলে চলবে না। আমার সন্দেহ যদি সত্যি হয়, তা হলে ওরা এখানে আসবে। লোকজন দেখলে ওরা ধরা

দেবে না।"

অবনীবাবু চলে গেলেন। ওঁর জিপের আলো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ডাক্তারবাবু উসখুস করছিলেন। মন্দিরের চাতালে অর্জুন বসেছিল তাঁর পাশে। চারপাশ নিঃশব্দ, পাতলা অন্ধকারে মাখামাখি। ডাক্তারবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা অর্জুনবাবু,

এসব করে আপনার কী লাভ হয়? এই কেসে তো আপনার কোনও ক্লায়েন্ট নেই যে, টাকা দেবে!"

অর্জুন হাসল, "টাকার চেয়ে অনেক বেশি পাব, যদি দেশের জন্যে মূর্তিটা বাঁচাতে পারি।"

"কিন্তু আপনারও তো টাকা দরকার।"

"তা তো অবশ্যই।"

"চলুন, শুয়ে পড়বেন। আমার ওখানে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ অর্জুন প্রশ্ন করল, "আপনাকে ওরা কত টাকা ফি দিয়েছে?"

লোকটি যেন হকচকিয়ে গেল, "মা-মানে?"

"আপনার সাহায্য ছাড়া ওরা তারিণী সেনকে নিয়ে যেতে পারত না।"

"হ্যাঁ। উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।"

"আমি বিশ্বাস করি না। আপনাকে আমি ওদের সম্পর্কে সচেতন করে গিয়েছিলাম, কিন্তু আপনি টাকার লোভে সেটা শোনেননি।"

"আপনি কি মনে করছেন তারিণী সেনের ক্ষতি করতে চেয়েছি আমি?"

"না। ওরা আপনাকে বুঝিয়েছে যে, ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে রোগ সেরে যাবে, আর এটা আপনি টাকার বিনিময়ে বুঝেছেন। তাই তো?"

এবার ভদ্রলোকের গলার স্বর পালটাল, "বিশ্বাস করুন, আমি ভাবতে পারিনি ওরা ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে না।"

"আপনি যান। শুয়ে পড়ুন।"

ডাক্তারবাবু মন্দিরটার দিকে তাকালেন। তারপর ধীরে-ধীরে

উঠে গেলেন।

রাত থাকতেই গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। অর্জুন একা বসে ছিল, এবার দৌড়ে একটা আড়ালে চলে গেল। ওরা যদি তারিণী সেনের কাছে খবর নিয়ে মূর্তির জন্য ফিরে আসে, তা হলে তার পক্ষে একা বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। সঙ্গে কোনও অস্ত্রও নেই। এক্ষেত্রে একমাত্র উপায়, গ্রামের লোকদের জাগানো।

না, কালো অ্যাম্বাসাডার নয়। একটা পুলিশ ভ্যান থামল মন্দিরের সামনে। অর্জুন বেরিয়ে আসতেই ময়নাগুড়ি থানার এস আইকে চিনতে পারল। সে জানতে পারল, থানায় খবর দিয়ে অবনীবাবু ও সি-কে নিয়ে রওনা হয়ে গেছেন দোমহনির দিকে। ভদ্রলোককে কী করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে অর্জুন অনুরোধ করল তাকে ভ্যানে করে দোমহনিতে পৌঁছে দিতে।

দোমহনি এমন কোনও বড় জায়গা নয়। এক সময় বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলপথের স্টেশন ছিল। তখন একটা রেলওয়ের কারখানাও এখানে অনেককে অন্ন দিত। এখন ওসব নেই, দোমহনির দিন গিয়েছে। অর্জুন যখন পুলিশ ভ্যানে চেপে দোমহনিতে পৌঁছল, তখন অন্ধকার অনেক হালকা। কিছু-কিছু মানুষ এই সময় বিছানায় থাকতে পারে না, তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করে ওরা লালকুঠিতে পৌঁছল। অনেকটা নির্জনে ব্রিটিশ আমলের প্রায় পোড়ো বাড়িটির সামনে অবনীবাবুর জিপ দাঁড়িয়ে আছে। দু'জন পুলিশ পাহারায়। তাদের কাছে জানা গেল, সাহেবরা ভেতরে গিয়েছেন।

সাহেব শব্দটার অর্থ এখন বদলে গেছে। উচ্চপদস্থ মানুষকে সম্মান জানানোর জন্য সাহেব বলা হচ্ছে। অর্জুনের এটা পছন্দ হয় না। কেমন একটা কমপ্লেক্স আছে যেন শব্দটিতে। অর্জুন গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই অবনীবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি

www.boiRboi.blogspot.com

ময়নাগুড়ির ও সি-র সঙ্গে বেরিয়ে আসছিলেন, "না, মশাই। এখানে কেউ নেই। সমস্ত বাড়ি খুঁজেছি। সব খালি। কিছু লোক এখানে রাত্রে শোয়, তারা বলল কয়েক বছরের মধ্যে কেউ এখানে আসেনি।"

অর্জুন মাথা নাড়ল। তাপপর বলল, "চলুন, জলপাইগুড়িতে ফিরে যাই।"

যাওয়ার আগে ময়নাগুড়ির ও সি-কে সে বিস্তারিত বলে গেল লাল মন্দিরটার সম্পর্কে। এস আই যে ওখানে পাহারায় আছেন তা যেন কখনওই তুলে নেওয়া না হয়।

তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে থানার দিকে যেতে-যেতে ভোর হয়ে এল। অর্জুন বলল, "আমাদের একবার তিস্তা ভবনে যাওয়া উচিত।"

"কেন?"

"অনেকক্ষণ ডরোথির খবর নেওয়া হয়নি।"

অবনীবাবু থানা পেরিয়ে গেলেন।

দূর থেকেই কালো অ্যাম্বাসাডারটাকে দেখতে পেল ওরা। তিস্তা ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক পেছনে জিপ দাঁড় করিয়ে অবনীবাবু রিভলভারটা বের করলেন। গাড়িতে কেউ নেই। ওরা গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। চৌকিদারটার দর্শন পাওয়া যাচ্ছে না। সোজা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই নিচের লনে শব্দ হল। কয়েকজন যেন দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। তড়িঘড়ি নেমে এলেন অবনীবাবু। দুটো মানুষ ততক্ষণে গেটের কাছে পৌঁছে গেছে। গুলি করবেন কি না চিন্তা করার আগেই ওরা কালো অ্যাম্বাসাডারে উঠে বসল। অবনীবাবু ছুটে গেলেন চিৎকার করতে-করতে। গাড়িটি ততক্ষণে মুখ বদল করে ছুটে যাচ্ছে শহরের দিকে।

অবনীবাবু চিৎকার করলেন, "চলে আসুন! ওদের ধরবই!"

অর্জুন হাত নেড়ে না বলল। অবনীবাবু শুনলেন না। জিপ চালু করে অনুসরণ করলেন।

অর্জুন ওপরে উঠে এল। ডরোথির ঘরের দরজা খোলা। ঘরে ঢুকে সে অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। তারিণী সেন তার বিছানায় শুয়ে আছেন। পায়ের কাছে ওঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। পাশের চেয়ারে বসে ডরোথি ওর দিকে তাকাল, "উনি ঘুমোচ্ছেন।"

"কেমন আছেন উনি?"

"ভাল।"

"ওঁকে এখানে নিয়ে এসেছ কেন?"

"উনি নিজের ইচ্ছায় এসেছেন। আমি জোর করে আনিনি। ওঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করো।"

"ওঁকে তোমরা হাসপাতালে ভর্তি করবে বলে নিয়ে এসেছ!"

www.boiRboi.blogspot.com

"আমি তো কিছুই জানি না। আমি কোনও প্রমিস করে ওঁকে আনিনি। উনিই আমার সঙ্গে সস্ত্রীক দেখা করতে এসেছেন। জিজ্ঞেস করো।"

অর্জুনের মনে হল তারিণী সেনের দ্বিতীয়া স্ত্রীকে প্রশ্ন করলে ওই জবাবই পাওয়া যাবে। সে জিজ্ঞেস করল, "তোমার সঙ্গীরা পালাল কেন?"

"এর উত্তর ওরা দিতে পারবে। আমি নই।"

"মূর্তির সন্ধান পেয়েছ?"

"নাঃ। এই বৃদ্ধ বড় শক্ত মানুষ। কিছুতেই ভাঙবেন না। আমি ওঁকে শেষ পর্যন্ত দু' লক্ষ টাকার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু উনি ওই একই কবিতা বলে যাচ্ছেন।"

অর্জুন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করল, "দু' লক্ষ টাকাতেও উনি বলতে

রাজি নন ?"

বৃদ্ধা বিকৃত মুখ করে জবাব দিলেন, "মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গেছে।"

এই সময় তারিণী সেন চোখ খুললেন। অর্জুনকে দেখে হাসলেন।

অর্জুন এগিয়ে এল, "মূর্তিটার হদিশ দিলেন না ?"

"যে পারো খুঁজে নাও।"

"আপনাকে এখানে জোর করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে ?"

তারিণী সেন ডরোথির দিকে তাকালেন, "ছেলেমানুষ !"

"টাকার লোভেও ওদের মূর্তিটা দিলেন না ?" অর্জুন বিছানার পাশে দাঁড়াল।

"হাত বাঁচাতে যখন দিইনি, তখন... ।"

"কেন দিচ্ছেন না ?"

"আমি ছিলাম ডাকাত। কমলাবাবু স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর কাছে কিছু না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমিও তো কিছু করতে পারি। দেশের জন্যে।"

অর্জুন শিহরিত হল। তারপর বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কিছু বলল। বৃদ্ধ মাথা নাড়তে লাগলেন, "হল না, হল না।"

"তা হলে ?"

"কমলা খাও। বুদ্ধি খুলবে।"

ঠিক এই সময় অবনীবাবু ফিরে এলেন। লোক দুটো ধরা পড়েছে। তাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ডরোথির ব্যাপারে কী করা হবে, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা দরকার। ওদের কারও বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও অভিযোগ টিকবে না। মূর্তিটা পাওয়া না গেলে সেটাকে চুরি করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা যাবে না।

অর্জুনের মতে ডরোথিকে তার দেশে চলে যেতে দেওয়া উচিত। মেয়েটা কখনওই জাত-অপরাধী নয়। অপরাধীরা নিজের অন্যায় আগেভাগে স্বীকার করে না। তারিণী সেনকে পূর্বদহে ফিরিয়ে দেওয়ার আগে জলপাইগুড়ির হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাতে হবে।

অবনীবাবু একা বৃদ্ধকে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি বলছেন লাল মন্দিরে মূর্তি নেই ?"

"কিছুই বলিনি। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।"

"অনুগ্রহ করে বলুন না !"

"কমলার রঙ লাল। কমলা খেয়েছ কখনও ?" বৃদ্ধ হাসতে লাগলেন।

ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল চেক-আপের জন্য। ওঁর স্ত্রীও সঙ্গে গেলেন। ডরোথির পাসপোর্ট নিয়ে গেলেন অবনীবাবু। সে রইল তিস্তা ভবনেই। সিদ্ধান্ত নিয়ে দুপুরের মধ্যে জানিয়ে দেবেন, ডরোথি ফিরে যেতে পারবে কি না !

www.boiRboi.blogspot.com

সকালের রাস্তায় হাঁটছিল অর্জুন। বাবুপাড়ায় কমলাকান্ত রায়ের বাড়ির সামনে পৌঁছে সে বৃদ্ধকে দেখতে পেল। ভদ্রলোক একটি শিশুকে নিয়ে পায়চারি করছেন। অর্জুন তাঁকে নমস্কার করতেই তিনি বললেন, "আসুন। আপনার চেহারা অমন কেন ?"

অর্জুন হাসল, "রাত জাগতে হয়েছিল।"

"চা খাবেন ?"

"আপত্তি নেই।"

"আসুন। একটু অপেক্ষা করতে হবে। পুজো শেষ হলেই প্রসাদও নেবেন।"

"আপনার বাড়িতে রোজ পুজো হয় নাকি ?"

"হ্যাঁ। বাবা এটা চালু করেছেন। হরেক রকম দেবদেবী।"

"দেখা যাবে?"

"নিশ্চয়ই।"

বৃদ্ধ ওকে ভেতরে নিয়ে এলেন। ঠাকুরঘরের সামনে এসে অবাক হল অর্জুন! দরজাটা কালো রঙ করা। ভেতরে একজন মহিলা পুজো করছেন। আসনে অনেক রকম ঠাকুর। রাধাকৃষ্ণ চোখে পড়ল। পাশে একটি লালচে অদ্ভুত মূর্তি।

"ওটা কোন দেবতা?"

"জানি না। বাবা এনেছিলেন। বলেছিলেন ভক্তিভরে পুজো করতে; করা হচ্ছে।"

"কাছে যেতে পারি?"

"যান।"

অর্জুন লালচে পাথরের মূর্তিটাকে দেখল। বৃদ্ধের সঙ্গে মিল আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "এই মূর্তি উনি কোথায় পেয়েছিলেন?"

"তা তো জানি না। সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট সকালে ওটাকে বাড়িতে এনে বলেছিলেন, 'লোকটা আমাকে অবাক করে দিল। এই দিনে এমন উপহার, আশা করিনি! যত্ন কোরো একে, আর সাবধানে রেখো।' বাবাকে প্রশ্ন করার সাহস আমাদের ছিল না, তাই করিওনি। আসুন। পুজো হয়ে গিয়েছে।"

আধঘণ্টা পরে অর্জুন করলা নদীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল একা। তারিণী সেন ডাকাত ছিলেন, কিন্তু সারাজীবনে তাঁর অর্থাভাব মেটেনি। শেষ সময়েও কিন্তু টাকার কাছে নিজেকে বিক্রি করলেন না। কমলাকান্তবাবুর প্রতি তিনি দুর্বল ছিলেন। নিজে যা পারেননি, তার জন্য হয়তো আফসোস ছিল; নইলে স্বাধীনতার দিনে ওই উপহার কেন কমলাকান্তকে দেবেন!

এমন মানুষ দ্রুত কমে যাচ্ছে ভারতবর্ষ থেকে। বৃদ্ধের হাসিমুখ মনে পড়ল। ফিক করে হেসে বলেছিলেন, "কমলা খাও। বুদ্ধি বাড়বে।"

বাড়েনি। রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড যে বিনা কারণে তারিণী সেন আর কমলাকান্তকে এক ব্র্যাকেটে রাখেননি, এটা সে যেমন বুঝতে পারেনি, তেমনই ডরোথি বা তিব্বতিরাও পারেনি।

অতএব এই রহস্য ফাঁস করে কোনও লাভ নেই।

www.boiRboi.blogspot.com

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার। যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com